স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু।

জন্ম - ৮ই অগ্রহায়ণ শনিবার
১২৫০ সাল।

মৃত্যু - ৮ই আশ্বিন সোমবার
১৩১৯ সাল।

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা।

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

—:✱:—

কলিকাতা।

মূল্য ॥৵১০ আনা মাত্র।

কলিকাতা।

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

৭ই আশ্বিন ১৩২১ সাল।

উৎসর্গ-পত্র।

বঙ্গের

দার্শনিক-গুরু

পূতচরিত্র, ঋষিপ্রতিম, ব্রহ্মৈকনিষ্ঠ,

পরমার্চ্চনীয়

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের

পবিত্র নামে

স্বর্গীয় পিতৃদেবের সর্ব্বশেষ গ্রন্থখানি

আন্তরিক ভক্তি ও চিরকৃতজ্ঞতার

নিদর্শন-স্বরূপ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

নিবেদন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল পিতৃদেব পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকখানি পুস্তক আজিও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। "ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা" তাঁহার জীবনের শেষ লেখা। ইহার প্রথম প্রবন্ধ ১৮২৯ শকের অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পিতৃদেব নানা রোগ-শোকের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা একদিনের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমারও অনেক দিনের যোগ—কিন্তু তাঁহার মত অনন্য-সাধারণ কর্ম্মী ও ভক্ত জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া দারিদ্র্য ও সন্তাপের কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার যুবজনোচিত উৎসাহ একদিনের জন্যও ম্লান ভাব ধারণ করে নাই। লেখনী-মুখে ব্রাহ্মসমাজের ভাব প্রচার করিতে করিতে আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে থাকিয়াই দেহপাত করিবেন, ইহাই তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনালোক নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরা তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজ গ্রামে লইয়া যাই। শয্যাশায়ী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনার কথা ভাবিতেন। উত্থানশক্তি রহিত, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের বিষয় লইয়া পরমার্চ্চনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার পত্রালাপের বিরাম ছিল না। রোগের প্রলাপের মধ্যেও ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনার কথা প্রকাশ পাইত। তিনি জীবনের শেষ দিনে পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের সহানুভূতিপূর্ণ অভয়বাণী প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্তভাবে বলিয়াছিলেন—"মরণে আমার আর খেদ রহিল না! আমার কর্ম্ম শেষ হইয়া থাকে আমি চলিয়া যাইব।" আজিও সে কথা আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে!

পিতৃদেবের অন্তিমশয্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া স্থির করিয়াছিলাম—যে কোন উপায়ে হউক তাঁহার শেষ-নিঃশ্বাসবিজড়িত 'ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া তাঁহার তর্পণ করিব। এতদিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। পিতৃদেবের এই সর্ব্বশেষ গ্রন্থখানি তাঁহার স্বর্গারোহণের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক পর্ব্ব দিবসে সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি এবং সর্ব্বার্থবিধাতা পরমেশ্বরকে নমস্কার করিতেছি।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, পূজনীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ মহাশয়ের আগ্রহ, যত্ন ও উৎসাহে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। তিনি নিজের সময়াভাব সত্ত্বেও ইহার অনেকাংশ দেখিয়া দিতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করেন নাই। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহ না পাইলে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হইতাম না। এজন্য তাঁহার নিকট চিরঋণী রহিলাম।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তকের প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি নানা বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই পুস্তকখানি কাহারও কোন উপকারে আসিলে পরিশ্রম [illegible]ক জ্ঞান করিব।

শারদীয়া পঞ্চমী।
আদিব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা।
১৩২১।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।

সূচীপত্র।

বিষয় পত্রাঙ্ক।

বিবিধ প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের সাধ্য ও সাধনা।

প্রথম প্রবন্ধ

ব্রাহ্মসমাজের মূলভাব।

বৈদিককালের ব্রাহ্মণগণ, মনু ব্যাস কপিলাদি শাস্ত্রকারগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ, অতুল্যকীর্ত্তি সীতাপতি রামচন্দ্র, পঞ্চ পাণ্ডব সহ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম বিদুর নারদাদি ধর্ম্মবক্তাবর্গ এবং অধুনাতন কাল পর্য্যন্ত সাধু ও আচার্য্যগণ, উপদেশ ও অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহার পরিস্ফুরণ স্থল ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব এই যে উহা সকল প্রকার বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক মূল ধর্ম্ম লইয়া সমুত্থিত হইয়াছেন। গীতা গ্রন্থ

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥

ঋষিভি র্বহুধা গীতং—

ইত্যাদি বাক্যে যাঁহার উপাসনার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকে একত্র নিমন্ত্রণ করিবার আশায় ছিল, ব্রাহ্মসমাজ কোন বাধা বিঘ্ন না মানিয়া সেই পরম দেবতার উপাসনার

নিমিত্ত নিঃসঙ্কোচে সকল মনুষ্যকে সমাহ্বান করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি একটী মন্দির বলিয়া ধরা যায়, তাহার ভিত্তিমূল প্রস্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্য যেন খোদিত দেখা যাইবে—

অথ ঋষয়ো দধুস্ত্বয়ি মনোবচনাচরিতং।
কথমযথা ভবন্তি ভুবিদত্তপদানি নৃণাম্॥

ঋষিগণ একমাত্র তোমাতেই মন বাক্য ও কর্ম্ম অর্পণ করেন। মৃৎ পাষাণ ইষ্টকাদি যে কোন বস্তুর উপরে পদ রক্ষা কর, তাহাতে এক পৃথিবী আশ্রয় স্থান হয়েন, ইহার অন্যথা হইবে কেন?

ইহারই প্রতিধ্বনি প্রত্যেক শিবপূজকের মুখে বিশ্রুত হয়ঃ—

নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

ব্রাহ্মসমাজরূপ মন্দিরের অন্তঃপৃষ্ঠে শ্রীমদ্ভাগবতের এই মূল বাক্য অঙ্কিত বিবেচনা করা যায়ঃ—

বদন্তি তং তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলা যায়। তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরমাত্মা, কেহ ভগবান বলেন।

ব্রাহ্মসমাজের মূলভাব

একই পরমাত্মা নানা নামে আরাধিত হয়েন, মনু-বাক্যে এমন ধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥

সেই পরমপুরুষকে কেহ অগ্নি বলেন, কেহ প্রজাপতি মনু বলেন, কেহ ইন্দ্র বলেন, কেহ প্রাণ বলেন এবং অপর কেহ শাশ্বত ব্রহ্ম বলেন।

ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা ব্রহ্ম নামের সার্ব্বভৌমিকত্ব দৃঢ়-রূপে স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ভাগবতোক্ত

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।"

এই তত্ত্ব সুব্যক্ত হইতেছে।

শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা হইতে অসম্যগ্‌দর্শী লোকের মনে হইত, শাস্ত্রে যে পরমতত্ত্ব-বোধক ব্রহ্ম শব্দ দেখা যায়, তাহা অর্থবাদ (প্রশংসাপর বাক্য) মাত্র। এক্ষণে জ্ঞাতব্য শাস্ত্র সকল সম্পূর্ণ প্রকাশ হওয়ায় সম্যগ্‌দর্শনে প্রত্যয় হইতেছে যে ব্রহ্মতত্ত্ব ভিন্ন কোন শাস্ত্রেরই অর্থসঙ্গতি হয় না। বর্ত্তমান কালে নানা বিধানে যত শাস্ত্রব্যাখ্যা চলিতেছে, ততই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রচার-দ্বার ব্যায়ত হইতেছে।

যেমন গীতা গ্রন্থে, তেমনি যোগবাশিষ্ঠে নিষ্কাম কর্ম্মের বহু উপদেশ আছে।

"যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি।"—গীতা

সেই উপদেশের সার। পরন্তু এই কর্ম্মক্ষেত্রে—ধরামণ্ডলের সর্ব্ববিভাগে প্রতিযোগিতামূলক নীতি এবং জয়-পরাজয় লক্ষণোপেত রাজসিক কর্ম্মের এত বাহুল্য হইতেছে যে এক্ষণে—

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। গীতা ২।৩৭

এবম্বিধ উগ্রকাম কর্ম্মাত্মক উত্তেজনা বাক্যেরই অধিক প্রচার দেখা যায়। এমত অবস্থাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াইলেন, আত্মত্যাগী ও ঈশ্বর-প্রীতিকাম হইয়া সর্ব্বশক্তিতে লোকমঙ্গল সাধনা করিতে হইবে। তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি শিরোধার্য্য হইল,

ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগেহস্য সিদ্ধিদঃ। ১১।২০।৮

সাংসারিক কর্ম্মে ক্লিষ্টমনা হইবে না; অত্যন্ত আসক্তও হইবে না, ভক্তিযোগে ঈশ্বর-সেবা বোধে কর্ম্ম কর, তাহাতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

নিঃশ্রেয়স বা পরম পুরুষার্থলাভের ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। এই পথে চলিতে চলিতে সুখ দুঃখ বন্ধন ও

মুক্তির পরিচয় স্পষ্টতর হইতে, থাকিবে। তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ চতুর্বর্গ সাধনা হইবে এবং ঈশ্বরনিষ্ঠায় ও ঈশ্বরকৃপায় সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইবে।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে যে তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, ইহাতে জানা যাইবে যে,—ব্রাহ্মসমাজ "বিগতবিবাদং"। সর্ব্বসাধারণ লোকের মধ্যে অবিরোধ অর্থাৎ শান্তি স্থাপন উদ্দেশে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু শ্রীমদ্‌গৌড়পাদাচার্য্যের সময় হইতে যে নির্ব্বিরোধ ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী বীজরূপে রোপিত হইয়াছিল, মহাত্মা রামমোহন রায় তাহাতে জল সিঞ্চন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া এই বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মূল দেশে যে রস সঞ্চারিত ছিল, শাখা প্রশাখায় তাহারই আস্বাদ মিলিবে, রসান্তর ঘটিবে না। যদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত কাহারও বিরোধাভাস ঘটে, তাহাতে এই তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইবে যে "অহম্পূর্ব্বমহম্পূর্ব্বম্" আমি অগ্রে আমি অগ্রে এবম্প্রকারে তিনি বা তাঁহার সম্প্রদায় ধর্ম্মপথে অগ্রগামী হইতে চাহিবেন।

তথাস্তু। ব্রাহ্মসমাজ কাহারও প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী

নহেন। তবে ব্রাহ্মসমাজের চিরদিনের কথা এই যে অধর্ম্ম নিবারণের চেষ্টা কর, নতুবা ধর্ম্মের উন্নতি হইবে না, অজ্ঞান অপসারিত কর, নতুবা জ্ঞানের উন্নতি হইবে না।

অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মকে পরাভূত করে। কালে কালে যুগে যুগে ধর্ম্মের এবম্প্রকার গ্লানি দূর করিবার নিমিত্ত নূতন বিধানে কার্য্য হয়। সেই বিধানে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে।

ফলতঃ অজ্ঞান ধ্বংস এবং অধর্ম্মের পরাভব আবশ্যক। এতন্নিমিত্ত সর্ব্ব দেশীয় গুরু আচার্য্য ও সর্ব্বভূতহিতেরত সাধুসজ্জনের অবিরাম যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ একনিষ্ঠায় তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন।

বর্ষা ও শরৎ ঋতু চাতুর্ম্মাস্য ব্রতকাল। এই কালে এ দেশের লোক কর্ত্তৃক বিবিধ ব্রতের আরম্ভ ও প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রাহ্মসমাজেও এই লক্ষণ দেখা যাইবে।

১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে এই আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহের দক্ষিণে প্রথম ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসের মধ্য ভাগে অনন্তচতুর্দ্দশী তিথিতে ইংলণ্ডে মর্ত্ত্য দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রবেশ করেন। তাহার

৬ বৎসর পরে দেবপ্রভাব দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিন রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেন। তাহার ৪ বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হয়।

এবম্প্রকারে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মতত্ব সংস্থাপনরূপ যে এক মহাব্রতের আরম্ভ করিয়াছেন, তাহারই কার্য্য উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে।

শান্তিশতকের কবি শিহ্লন মিশ্র খেদ করিয়া বলিয়াছেন—

সোঢ়া দুঃসহশীতবা ততপন
ক্লেশা ন তপ্তং তপঃ।

গৃহস্থেরা দুঃসহ শীতবাত তপন ক্লেশ সহ্য করে, কিন্তু তদ্দারা তাহাদের তপস্যা হয় না। যৌবনকালে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় প্রান্তে দুঃসহ শীত-বাত-তপন ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজৈশ্বর্য্যশালী গৃহস্থের তপঃ প্রভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ সেই পথের পথিক হইতে সকলকে বলিতেছেন। তাহাতে বাস্তবিক তপস্বিজনসাধনীয় মহাপুণ্যের অর্জ্জন হইবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

অধ্যাত্ম শাস্ত্রাবলম্বন।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবাসরে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই দিন হইতে ধরিলে ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষ অতিক্রম করিল। আর কয়েক বৎসর পরে ইহার শতায়ু গণনা হইতে থাকিবে।

এই অশীতি বর্ষে ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হইয়াছে, তাহা কোন না কোন প্রকারে পৃথিবীর সকল দেশেই পরিগৃহীত হইতেছে। এতকালে ইহার সাধ্য ও সাধনার বিষয় পরিস্ফুট হওয়া সম্ভাবিত। যথামতি এই মহদ্ব্যাপারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন এদেশে ধর্ম্মের আলোচনা কি প্রকার হইত এবং কোন্ অভাব পূরণার্থ ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাই প্রথমে দ্রষ্টব্য।

কলিকলুষবর্ণনা এদেশের প্রায় সকল শাস্ত্রে আছে। ধর্ম্ম সঙ্কুচিত, তপস্যা বিচলিত, সত্য দূরগত, ক্ষৌণী মন্দফলা ইত্যাদি কলিলক্ষণ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে।

এক্ষণে অন্যান্য বিদ্যানুশীলনের সহিত সমগ্র ভারতেতিহাস, বিশেষতঃ ইহার পতন দশা ভাবিতে থাকিলে ঐ সকল কুলক্ষণ তীব্রতররূপে আমাদের হৃদয়ে আঘাত করে। পরন্তু "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" (গীতা ৬।৫) ইত্যাদি উদ্ধার-মন্ত্রও তো এদেশে সনাতন ধর্ম্মের মজ্জাগত রহিয়াছে। ঘরে ঘরে দেবদেবীর আরাধনার যথেষ্ট পরিচয় পূর্ব্বাপর বিদ্যমান। কল্যাণ-সঙ্কল্পিত ক্রিয়াকলাপের অধিক অভাব নাই। কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রের সহিত গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং যোগবাশিষ্ঠাদি অধ্যাত্ম-শাস্ত্র সকলও প্রচারিত আছে। তবে কিসের অভাব ছিল? জ্ঞানের অভাব। অস্থি-চর্ম্মসার নির্জ্জীব মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ, এদেশে সমুচিত জ্ঞান-চর্চ্চার অভাবে ধর্ম্মের সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। শয্যাশায়ী ক্ষীণকায় মনুষ্যকে যেমন অপর বলবান্ লোক ইতস্তত লইয়া যাইতে পারে, ফলাভিসন্ধি ও তর্কশক্তি প্রবল হইয়া ধর্ম্মকে সেইরূপ নানা পথে চালিত করিতে সমর্থ হয়। ধর্ম্মের নানা মত, বহু পন্থা, এদেশে যেমন বিস্তারিত, এমন আর কোথাও নাই।

দীর্ঘকালের অবসাদে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়; মনুষ্যের দুঃখ ও তমোরাশি ঘনীভূত হইয়া আইসে; ইহা শাস্ত্রের উক্তি। এমন অবস্থায় ঈশ্বর কোন কোন অংশে

কোন কোন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন, ইহাও ঐ শাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পক্ষে সেরূপ কোন দৈবশক্তির সাহায্য লক্ষিত হয় নাই। তবে ব্রাহ্মসমাজ কি লইয়া কি করিতে আবির্ভূত হইলেন?

যাঁহারা ঈশ্বরাবতার বা ত্রিকালদর্শী ঋষি বলিয়া এদেশে পূজিত হইতেন, তাঁহারা আর বর্ত্তমান নাই।* তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তনে পুনশ্চ ধর্ম্মসংস্কার হইবে, এমন প্রত্যাশাও নাই। তাঁহাদের অনপেক্ষায় তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বেদাদি শাস্ত্র বিদ্যমান। ব্রাহ্মসমাজ সেই শাস্ত্র সকলকে অবলম্বন করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের অবলম্বিত প্রধান শাস্ত্র ব্রহ্মসূত্র এবং উপনিষৎ। এই দুই অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদান্তের প্রচার হেতু এবং তন্নিষ্ঠা প্রযুক্ত ব্রাহ্মসমাজকে বেদান্ত-সমাজ বলা হইত। আদিম অবস্থার ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ উপাসকেরা বৈদান্তিক বলিয়া পরিচিত হইতেন। বৈদান্তিক শাস্ত্রকে জ্ঞানদীপ কহা গিয়া থাকে। অজ্ঞানবিনাশ উঁহার অভিলক্ষিত অতএব ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য অজ্ঞাননিরাস এবং জ্ঞানোদ্দীপনা, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেনমুহ্যন্তি জন্তবঃ। গীতা ৫।১৫

---

* কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতা ভা ১।৩।২৭

গীতার এই মত—পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, এই তত্ত্ব না জানিয়া অজ্ঞানে অর্থাৎ বিষমদর্শনে লোক মোহগ্রস্ত হয়; মোহপ্রযুক্ত দুঃখকেও সুখ বোধ হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে মনুষ্যের মোহান্ধকারের বিনাশ এবং ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইবে। ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের নির্য্যাস কথা। তাহাই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্ব্বে সন্ন্যাসী এবং তদ্ভাবাপন্ন গৃহস্থেরা অধ্যাত্ম বিষয়ের চর্চ্চা করিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, মোহমুদ্গর, হস্তামলক, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহাদের পঠনীয় ছিল। শ্রীভাগবতকেও অধ্যাত্মদীপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল শাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন হইত না। গৃহস্থদিগের পক্ষে উহা দূরবর্ত্তী দীপশিখার ন্যায় প্রতিভাত হইত। ব্রাহ্মসমাজ "একমেবাদ্বিতীয়ং" মন্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক তদেকনিষ্ঠায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ঐ সমাজের উপাসকেরা "ব্রহ্মজ্ঞানী" এই পৃথগভিধান প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিয়াছেন। জাতি অর্থে নয়, ব্রহ্মের উপাসক, এই অর্থে, তদ্ধিত প্রত্যয়ে, ব্রাহ্মশব্দ নিষ্পন্ন হয়। সেই অর্থে ব্রাহ্মসমাজ নাম পরিগৃহীত হইয়াছে।

একনিষ্ঠা হেতু শৈব ও বৈষ্ণবাদি নামের ন্যায় ব্রাহ্মনামে এই ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থদিগকে বুঝাইতেছে। "ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহস্থ" এই ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বে এদেশে সন্ন্যাসী অথবা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ পণ্ডিতগণ বেদান্তশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান পুরুষেরা শ্রুতি নামে ব্রহ্মসূত্র বা উপনিষদের প্রমাণ ধরিয়া গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তখন বা তৎপূর্ব্বে উপনিষদ্‌দেবীর দশা কেমন ছিল, তাহা সংস্কৃত নাটক—প্রবোধচন্দ্রোদয়ে বিবৃত হইয়াছে।

উপনিষৎ মন্দর-পর্ব্বতে গীতার সহিত বাস করিতেছিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে আনা হইল। কেহ (আত্মাপুরুষ) সেই সমাগতা উপনিষৎকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অম্ব! কথ্যতাং ক্ব ভবত্যা নীতা এতে দিবসাঃ।

মা! বল দেখি, এত দিন কোথায় কাটালে?

উপনিষৎ উত্তর দিলেন,—

স্বামিন্!

নীতান্যমুনিমঠচত্বরশূন্যদেবা
গারেষু মূর্খমুখরৈঃ সহ বাসরাণি।

"মঠের চত্বর আদি আর যেথা যত আছে,
শূন্যগর্ভ দেব-নিকেতন।
সেই সব স্থানে আমি মুখর মুরখ-সনে,
করিনু গো দিবস যাপন॥

পুনশ্চ প্রশ্ন হইল :—

অথ জানন্তি তে ভবত্যাস্তত্ত্বম্।

"আচ্ছা! তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে ?

উত্তর :—

ন খলু ন খলু কিন্তু

না না কিছুমাত্র না।

তে স্বেচ্ছয়া মম গিরাং দ্রবিড়াঙ্গনোক্ত
বাচা মিবার্থ মবিচার্য্য বিকল্পয়ন্তি॥

তেন তেষাং কেবলং পরার্থ গ্রহণ প্রয়োজনকমেবমদ্বিধারণাম্।

মম বাক্য-অর্থ তারা
না করি বিচার যথাযথ
দ্রাবিড়-স্ত্রী-উক্তি-সম—
ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত॥

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ * গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।"†

---

* অর্থ—ধন। ধন চেষ্টায় ধনীদিগের মনোমত বাক্যরচনা। আমার বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে।

† শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

মনুসংহিতায় দেখা যায়, উপনিষৎ পাঠ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের কর্ত্তব্য। * শ্রীমদ্ভাগবতেও উহার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। ‡ ব্রাহ্মসমাজ সেই উপনিষৎ শাস্ত্রকে আরণ্য আশ্রম হইতে আনয়ন করিয়া গৃহস্থমণ্ডলীর মধ্যে পরমপূজ্য উচ্চ আসনে বসাইয়া রাখিয়াছেন। অধিকন্তু উহার অর্থ ও তাৎপর্য্য স্বদেশী বিশদ ভাষায় অবতারিত করিয়া তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের সুগোচর করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে উহা আর দ্রাবিড়ী স্ত্রীর কথোপকথনের ন্যায় অবোধ্য থাকিতেছে না। উহা সর্ব্বজনের সেবনীয় হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের উহাই প্রথম সাধনার 'বিষয়'। শ্রুতিশিরঃ বেদান্তগ্রন্থ পাঠের পর সমস্ত বেদপাঠের নিমিত্ত আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। পরে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত বেদ ও তাহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সকলকে তাহাদের

---

* মনু ৬।২৯, ৯৪।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত ৫ স্কন্ধ ২৬ অধ্যায়। ৩৯। যতি ব্যক্তি স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রবেশ করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৭ স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ১১'শ্লোকে দেখা যায়:—ব্রহ্মচারী যখন বেদপাঠে রত থাকেন, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে তিনি হয়ত একবারেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, তখনও তাহার উপনিষৎসহ তিন বেদের পাঠ এবং তাহার যথাশক্তি তত্ত্ব বিচার করিবার বিধি ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ১৮ অধ্যায়। ৩৪ এবং ৩৮ শ্লোক।

নিভৃত নিলয় হইতে প্রকাশ্যস্থলে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমদ্ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনচরিতে বিদিত হয়।

শ্রুতির পর স্মৃতি এবং তাহার পর মহাভারত রামায়ণ, পুরাণ ও মহানির্ব্বাণাদি শাস্ত্র বিপুলায়াসে অনুবাদ সমেত প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্টি প্রসারিত হইলে, তৎসমুদায়ের সমন্বয়ে অসন্দিগ্ধ সারবৎ বিশ্বতোমুখ সত্যার্থ সকল নির্ণয় করিবার পথ সুগম হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার একান্ত প্রয়োজন বোধ হইলে তাহার সংসাধনার্থ বহু লোকের স্বতন্ত্র চেষ্টা এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণের লেখনীয় কার্য্য আবশ্যক হইয়াছিল।

কালে কালে এবং মনুষ্যসমাজের অবস্থাবিশেষে যে ধর্ম্ম উদ্গীত হইয়াছে, তাহার মূল তত্ত্ব ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে তবে তাহা বর্ত্তমান কালের ও বর্ত্তমান সমাজের উপযোগী হয়। ব্রাহ্মসমাজের অনুগত তত্ত্ববোধিনী-সভা বিংশ বৎসর এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই শাস্ত্রপ্রকাশ এবং শাস্ত্রার্থের ব্যাখ্যা পক্ষে এখনো যে অভাব আছে, তাহার সম্পূরণ নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজকেই চিন্তা করিতে হয়।

কেবল শাস্ত্র প্রচার, অথবা শাস্ত্র সমন্বয়ে সত্যার্থ প্রকাশ করা ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম, এমন নয়। সর্ব্ব-শাস্ত্রোদিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মে এবং সর্ব্বভূতাধিষ্ঠিত পরমাত্মার উপাসনায় মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার প্রজনন, এবং তাবৎ মনুজমণ্ডলীর সমবেতে ঈশ্বরারাধনা,—এই ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গীতাগ্রন্থের—

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ৪।১১

সর্ব্বপ্রকারে সকল মনুষ্য আমাকেই পাইবার পথে চলিতেছে, এই ভগবদুক্তি শাস্ত্রকথা মাত্র হইয়া রহিয়াছিল, তাহা এই প্রকারে ব্রাহ্মসমাজাদর্শে সংসিদ্ধ হইতে চলিয়াছে।

জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যের একত্র ঈশ্বর ভজনার অপূর্ব্ব শোভন দৃশ্য ব্রাহ্মসমাজেই আবির্ভূত হইয়াছে।

উপরি উক্ত মহাবাক্যের পূর্ব্বাংশ এই ঃ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।

—যাহারা আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমি সেইরূপে তাহাদের লভনীয় হই।

এই বাক্যে তত্ত্ববিচার এবং তদনুসারে ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের মধ্যে অবিরোধ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্ম-

সমাজের স্থাপনকালে ইহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যানে সেই অবিরোধের প্রতিজ্ঞা পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রের (আদিম) ব্যাখ্যানের মর্ম্ম এই :—

(যিনি জগতের কারণ, তাঁহাকে কেহ স্ত্রীরূপে কেহ পুরুষরূপে উপাসনা করেন। সেইরূপ ভারতবর্ষীয় এবং অন্য দেশীয় পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট দেবতার পূজকেরা পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন নামরূপের নির্দ্দেশ না করিয়া আত্মদর্শন সহকারে সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার যে উপাসনা হয়, তাহাতে কাহারই বিরোধ প্রবৃত্তি জন্মিবে না।)

এই ব্যাখ্যানে শ্রুতি স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণ এবং গোবিন্দাচার্য্যের প্রাচীন বাক্য ধরিয়া—

যতোবেতি যতো বাচ ইত্যাদি শ্রুতিসম্মতং

ব্রহ্মোপাসনা ঐহিক ও পারত্রিক পরম মঙ্গলকররূপে স্থাপন করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রাথমিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যানে বাহ্য আড়ম্বর ব্যতিরেকে কেবল শমদমাদি সাধনার অত্যন্ত আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রশান্তচিত্ত এবং শমান্বিত না হইলে ব্রহ্মোপাসনা হইবে না। অতএব ইন্দ্রিয়দমনাদি কার্য্যের প্রকরণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (সপ্তম ব্যাখ্যান।)

সেই আদিমকালের ব্রহ্মোপাসকেরা যে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিতেন, তাহা ঐ ধর্ম্মব্যাখ্যার সহিত সঙ্গত হইত ঃ—

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে।
কে দহে কলুষ রাশি বিনা জ্ঞানানলে॥

এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে সেই অবিরোধ পন্থা ধরিয়া পরমার্থ-সাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং বিবিধ উপায়ে লোকহিতব্রতের অনুষ্ঠান হয়।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের দশবর্ষ পরে উহার সহিত তত্ত্ব-বোধিনী সভার সংযোগ হইয়াছিল। ঐ সভায় জ্ঞানবিজ্ঞা-নের সম্যক্ আলোচনা হইত। সেই সভার মুখপত্রস্বরূপ তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা অদ্যাপি মাসে মাসে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার অবসানে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া-ছিল। তাহাতে কতকগুলি নিষ্ঠাবান্ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছাত্রকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করা হইত। ঈদৃশ ইষ্টজনক কোন সভা, সংঘ, ব্রহ্মবিদ্যালয় বা সাময়িক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অনু-করণে যথাসম্ভব "অবিরোধ" রক্ষা করা বিহিত হয়। সম্প্রতি ঐ সভার অনুরূপে জ্ঞান বিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ইন্দ্রিয় সংযমাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের উন্নতি উদ্দেশ্যে যে সমবেত চেষ্টা হয়, তাহা সাধনাশ্রমাদি নামে উক্ত হয়। ইহাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গাঙ্গীভাব বিবেচনা করিতে হইবে।

এই সাধনায় ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর অতিবাহিত হইল। এই অনতিদীর্ঘকালে ইহার যে পুষ্টি লাভ হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিবর্দ্ধনের ক্রম বুঝা যাইতেছে। অখিলমানবের বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তি ব্রাহ্মসমাজের পত্তনভূমি। অধ্যাত্মশাস্ত্র ইহার আলোকমণ্ডিত স্তম্ভ। সেই আলোকে সর্ব্বত্র সমদর্শন হয়। ব্রাহ্মসমাজে যিনি উপাস্য, তিনি যেমন নামরূপবিহীন, ব্রাহ্মসমাজ নিজেও তেমনি নামহীনতার অথবা বহুনামের পরিচয় দেয়। এক নামে নয়, এবং এক পদ্ধতিতে নয়, পরন্তু "প্রার্থনা সমাজ" "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা" ইত্যাদি বহুনামে এবং ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে আদিম ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা-স্থান রচিত হইয়াছে। দেশ-কালানবচ্ছিন্ন এবং সমদর্শন-সম্পন্ন অধ্যাত্ম শাস্ত্রের উক্তি এই :—

চরাচর সমস্ত বিশ্ব তাঁহার ভক্তিকভার ধ্যানে নিমগ্ন। *

---

* Habakkak II 20

বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ গীতা ১১।২২

নানা নামে সকল ব্রাহ্মসমাজ আত্মচিন্তায় সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মার উপাসনা করিতে থাকিবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ।

শাস্ত্রার্থ গ্রহণ।

প্রথম প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের মূলভাব বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধে উহার অবলম্বিত অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে দেখিব উহার শাস্ত্রাবলম্বন কি প্রকার এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি ?

ইহাতে প্রথম বিচার্য্য এই যে যাহার নিজের প্রজ্ঞা নাই, শাস্ত্র তাহার কি সাহায্য করিবে ? যাহার চক্ষুর দৃষ্টি নাই, তাহার পক্ষে দর্পণাদি ঈক্ষণ যন্ত্র নিরর্থক। * শাস্ত্রনিষ্ঠায় স্বকীয় প্রজ্ঞা অবহেলিত হইলে যথার্থ জ্ঞানোৎপত্তি হয় কি ?

এস্থলে শাস্ত্রের প্রকৃতি বিচার করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বিধি ও নিষেধমূলক শাস্ত্রেও মনুষ্যকে স্বকীয় প্রজ্ঞা বিনিয়োগ করিবার অবকাশ দেওয়া আছে ; অস্মদ্দেশে প্রজ্ঞাই ধর্ম্মের এক বিশিষ্ট প্রমাণ। কোন

---

* যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিং।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥

শাস্ত্রীয় বিচার ও সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধারহিত হয় না। যাহাকে মানবধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায়, তাহা বেদের নির্যাস; ইহা দেবগুরু বৃহস্পতির বচন। সেই শাস্ত্রে ধর্ম্মকে বিদ্বান্ ও সাধুজনের হৃদয়ানুমত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বেদকে ধর্ম্মের মূল বলিয়া ধারণা হইলেও তাহার সহিত স্মৃতি, সাধুদিগের শীল, এবং আপনার হৃদয়ের পরিতোষকে তাহার সহিত মিলাইয়া ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। *

মনুষ্যসমাজের আদিম কালে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই কাল হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল ব্যবহার একাদিক্রমে চলিয়া আসিতেছে,—যে যে বিধি-নিষেধ অবধারিত রহিয়াছে, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম বিনির্ণীত হয়। শাস্ত্রানুশীলনে সেই চিরজীবী নিত্যমঙ্গল সনাতন ধর্ম্ম পাইবার সন্ধান করিতে হইবে। তদ্দ্বারা অনুশাসিত হইলে, জনসমাজের

---

* বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥ মনু ২।১, ৬, ১২

আর অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রালোচনায় তৎপর হইয়াছেন।

ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টং শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণং।

ধর্ম্ম কি? যাহাতে শ্রেয় জন্মে। শ্রেয় কি? যাহাতে অভ্যুদয় অর্থাৎ উন্নতি হইতে থাকে।

নিম্ন স্তবকের শাস্ত্র ভবিষ্য পুরাণ। তাহাতে ঐ ধর্ম্ম লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে। পুরাণ অপেক্ষা স্মৃতির অধিক মান। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রুতি (বেদ)। সেই বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ (বেদান্ত)। ব্রাহ্ম-সমাজ সেই সকল শাস্ত্রের অবিসম্বাদী উপদেশ গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে এমন গন্তব্য পথ দেখাইতেছেন যে সে পথে মানবমণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন কুশল লাভ হইবে। অথবা এমনও বলা যায় যে, যাহাতে যাহাতে মনুষ্যের চিরদিন উন্নতি হইতে থাকে, সেই শ্রেয়ঃ সাধনায় ব্রাহ্মসমাজ সকলকে প্রবুদ্ধ করিতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে যে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার প্রথম বাক্য এই:—"ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি।" বেদবিৎ সাধু ব্যক্তিগণ যাহা বলিবেন, তাহা সকলের

"হৃদয়ানুজ্ঞাত" হইবে, ইহা অবশ্য আশা করা যায়। সেই চিরাচরিত ধর্ম্মে যে জনসমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবে না, তাহাও নিশ্চিত বোধ হয়। এই হেতু গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে জনকাদি প্রাচীন পুরুষদিগের মত ধরিয়া ধর্ম্মের প্রামাণ্য স্থাপন করা হইয়াছে। *

ব্রাহ্মসমাজ আদিম ধর্ম্মশাস্ত্র বেদান্তের অবলম্বনে এই বল পাইয়াছেন যে, অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই মূল শাস্ত্রের সম্বন্ধ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কালপ্রবাহী সনাতন ধর্ম্মের সন্ধান করিতে পারিবেন। কোন বিষয়ে এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের মত খণ্ডন করিলে তৃতীয় প্রামাণিক শাস্ত্র দ্বারা সেই মতের শুদ্ধি সমাধান হয়। শাস্ত্রের কূটার্থ অপেক্ষা সহজ অর্থ ই গ্রহণীয় হয়।

কেবল ঈশ্বরতত্ত্বের নিরূপণে তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যবসিত হয় না। চিন্তা তদভিমুখীন হইলে, অন্তর ও বাহ্যের দর্শন স্থূল হইতে সূক্ষ্মে গমন, আত্মীয় ও পর নির্ব্বাচন, ক্ষুদ্র ও মহতের বিজ্ঞান, পাপ ও পুণ্যের পরিচয়, বন্ধন ও মোক্ষের বিচার, এবং পরলোকের সহিত নিকট সম্বন্ধ, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। এমন যদি হয়, তবে তদভিজ্ঞানের যতগুলি

---

* কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ॥ গীতা ৩।২০

শাস্ত্র পাইয়াছি, এবং যত মনীষী লোকের ভূয়োদর্শন জানিতে পারিয়াছি, আরো যদি তত গুলি পাই, তথাপি সমাপ্তি বোধ হইবে না। কালের অনন্ততা এবং দেশের অসীমতা যুগ-যুগান্তরের শাস্ত্রে ব্যক্ত হয়। তদুক্ত শত শত প্রসঙ্গে দেবতার নিস্পৃহতার মধ্যে লোকাতীত প্রভাব, অসুরের প্রতাপের মধ্যে ক্ষুদ্রাশয়তা এবং সাধুজনের মৃদুতার মধ্যে মঙ্গলাবহ মহত্ত্ব—এ সমস্ত বিচিত্র ও আশ্চর্য্যজনক কথার সমাবেশ শাস্ত্রে দেখা যায়। বিজ্ঞানে জড়-প্রকৃতির মধ্যে আশ্চর্য্যজনক দৈবীশক্তি ও মঙ্গলপ্রবাহ প্রতিভাত হয়। এই নিমিত্ত চিরদিন শাস্ত্রের পূজা লোকসমাজে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

স্বকীয় প্রজ্ঞাদ্বারা যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে যদি প্রাচীন কালের শাস্ত্রের সায় পাই,—তাহাতে কত আনন্দ!! তেমন চিরমান্য মত বা বাক্য তদ্‌বক্তাদিগের মহনীয় চরিত্রের সহিত সংযুক্ত হইলে জনসমাজের সুশিক্ষার পক্ষে প্রভূত বল ধারণ করে। যাহা চিরমান্য সনাতন ধর্ম্ম, তাহার বিরুদ্ধবাদ সহজেই নিরস্ত হইবে।

শাস্ত্রসকল যুগপরিমাণে শত সহস্র বৎসরের মানবীয় শক্তি ও তদনুমত ধর্ম্মাচরণের তথ্য নিরূপণ করিয়াছেন। সেইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে—বাল্য যৌবনাদি চারি

অবস্থার বস্তু-বিচারের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের তারতম্য দেখা যায়। কার্য্যতঃ আমরা এককালে যে শাস্ত্রবাক্যের যে অর্থ বুঝিয়াছিলাম, পুনঃপুনঃ চিন্তায় সেই বাক্যের আরো গূঢ়তর অথচ ব্যাপক অর্থ উপলব্ধি করি। এই প্রকারে তত্ত্বানুসন্ধানে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, পর হইতে পরতরে এবং মহৎ হইতে মহত্তরে গতি ও উন্নতি হইতে থাকে। ঈশ্বরের জগৎ কার্য্যে যে মঙ্গলবিধান, তাহা যুগযুগান্তরের নানা অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে পরিস্ফুট হয়। তাহার যথালব্ধ জ্ঞানে শ্রেয়ঃ সাধন হইবে না। মনুষ্যের রুচ্যর্থ বা স্তুত্যর্থ যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, সামান্য জ্ঞানে তাহার এক প্রকার অর্থ হয়; তাহার অন্তরে প্রবেশ করিলে অন্যবিধ অর্থ পাই। একটী একটী শাস্ত্রীয় মত ও বাক্যের অন্তরে গৌণার্থ ও মুখ্যার্থ প্রথম কল্প ও অনুকল্প, ব্যবহারিক ও পারমার্থিক তাৎপর্য্য বিচার হইবে।

এক্ষণে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে শাস্ত্রোক্ত নানামতের এতাবৎ জটিলতা উচ্ছেদ করিতে মস্তক বিঘূর্ণন স্বীকার করি কেন? বিপুল আয়াসে শাস্ত্ররাশি আলোড়ন না করিলে কি ধর্ম্মবোধ ও ধর্ম্মপালন হইবে না ?

ব্রাহ্মসমাজ মনুষ্যের স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্ম-বিচার করিয়া লইবেন, এই প্রতিজ্ঞায় সমুত্থিত হইয়াছেন।

যে সমাজে বর্ণবিচার প্রবল ছিল, সে সমাজে শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের লোকেরা শাস্ত্রে অনধিকারী হইয়াও স্বধর্ম্ম পালন দ্বারা মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত। চাতুর্ব্বর্ণ্যের পক্ষে যে ধর্ম্ম নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রসেবার বিধান নাই। (মনু ১০।৬৩)। ইন্দ্রিয়দমন, সত্যকথন, শৌচাচার—এতদ্বারা যদি চারিবর্ণের লোকের ধর্ম্মপালন হয়, তবে সেই ধর্ম্মপালনের যোগ্যতাকেই সহজজ্ঞান-সিদ্ধ এবং পরম পুরুষার্থ সাধক বিবেচনা করিতে হইবে।

এস্থলে আর এক বিচার্য্য এই যে শাস্ত্র এমন জটিল কেন হইল? আমরাই তো উহার হেতুভূত। সত্য জানিলেও তাহাকে গ্রহণ করিব না; ন্যায় বুঝাইয়া দিলেও তাহা পালন করিব না; পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রম সর্ব্বদা ঘটাইতে থাকিব; এই বিষম অবস্থার প্রতীকার চেষ্টা থাকিলে কিরূপ কার্য্য হইতে পারে?

মানুষের প্রবৃত্তি অনায়ত্ত। তাহা নানাদিকে প্রধাবিত হয়। যিনি বক্রপথে চলিবেন, অথবা যিনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পতন স্বীকার করিবেন, তাহার শাসনকর্ত্তাকে কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের পথে আসিয়া উদ্ধারসূত্র আকর্ষণ করিতে হইবে। এইহেতু চারিযুগের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে শাসনকর্ত্তা,

শাস্ত্রবক্তা ঋষিদিগের দ্বারা সময়োপযোগী এক একটী শাস্ত্রীয় মত বা বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে।

আবার এমনও পথ রাখা হইয়াছে যে, নূতন কোন তর্ক সংশয় বা বিরোধ উপস্থিত হইলে বেদবিৎ পণ্ডিত এবং ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যাহা মীমাংসা করিয়া দিবেন, তাহাই পরিগ্রহণীয় হইবে। মনু ১২।১০৮।

বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন ভিন্ন,—এমন মুনি ছিলেন না, যাঁহার মত অন্য মুনির মত হইতে ভিন্ন নহে,—এই তর্ক তুলিয়া এক প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলনের প্রয়োজন নাই; উহার জটিলতার মীমাংসা হইবে না; অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। বর্ত্তমান নির্জীব ভারতে ঐ পন্থাই সকলের সুগম বোধ হয়।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে শাস্ত্রবিধিত্যাগকারী এক শ্রেণী শ্রদ্ধাবান্ লোকের কথা আছে। ঐ গ্রন্থের টীকাকারেরা বলেন, উক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত লোকেরা পরম্পরাগত কুলধর্ম্ম মাত্র জানেন। শাস্ত্ররাশি তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মত এই যে, সকলই বিচার

করিয়া লইতে হইবে। তত্ত্ববিচারে যে ভক্তি জন্মে সেই ভক্তি দ্বারা লোকের মুক্তি হয়। সেই মহাপুরাণে—

"বিধর্ম্মঃ পরমধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।" ৭।১৫।১২। ইত্যাদি বিচারে ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন। উহার মতে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় উপনিষদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন-পূর্ব্বক সাধ্যমত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।*

শ্রীমদ্ভাগবতের এত শক্তি কিসে? সহজজ্ঞানসিদ্ধ তত্ত্বনিষ্ঠায়। মঙ্গলাবহ তত্ত্ববিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তদ্বিরুদ্ধ মতসকলকে যথাসম্ভব খণ্ডন করাতে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবল শক্তি প্রকাশ পায়। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি ঃ—

কপিলের কোপাগ্নিতে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল, মহাভারতে (বনপর্ব্বে) ইহার বর্ণনা আছে।† বিষ্ণুপুরাণেও সেই কথা; কিন্তু অনলের উৎপত্তি স্থান ভিন্ন।

ততশ্চোদ্যতায়ুধা দুরাত্মায়মস্মদপকারী যজ্ঞবিঘাতকর্ত্তা
হয়হর্ত্তা হন্যতাং হন্যতাং ইতি অধাবন্।
ততশ্চ তেনাপি ভগবতা কিঞ্চিদীষৎ পরিবর্ত্তিত লোচনেন
বিলোকিতাঃ স্বশরীরসমুত্থেনাগ্নিনা দহ্যমানা বিনেশুঃ।

বিষ্ণুপুরাণ ৪।৪।১১

---

* শ্রীমদ্ভাগবত. ৭।১২.৬-১৩। † মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১০৭ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত বিষ্ণুপুরাণের মতের পোষকতায় বলিলেন,—মহৎ ব্যক্তির অপমান করায় তাহাদিগের নিজ নিজ দেহস্থিত অনলই তাহাদিগকে ক্ষণমধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিল। "সগরতনয়গণ কপিলকোপে দগ্ধ হইয়াছিল,"—ইহা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু সে কথা ভাল নহে। কারণ ভগবান্ কপিল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি, তাঁহার আত্মা ত্রিলোকপাবন, তাঁহাতে তমোগুণ সম্ভবে না। ৯ স্কন্ধ ৮অধ্যায় ১২ শ্লোক।

কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত উক্ত প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতকার আরো বলিয়াছেন—

যস্যেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহ নৌ
র্যয়া মুমুক্ষু স্তরতে দুরত্যয়ং।
ভবার্ণবং মৃত্যুপথং বিপশ্চিতঃ
পরাত্মভূতস্য কথং পৃথঙমতিঃ॥ ৯।৮।১৩

দুরত্যয় মৃত্যুপথস্বরূপ ভবসাগর। তাহা হইতে উদ্ধারার্থীর নিমিত্ত যিনি এই সংসার সাগরে সাংখ্যময়ী দৃঢ়া তরণী স্থাপন করিয়াছেন,—সেই আত্মভূত মহামুনির শত্রুমিত্রাদি ভেদদৃষ্টি কিরূপে সম্ভব হয়?

শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ উক্তিতে বর্ত্তমান সময়ের লোক বিততচক্ষু হইয়া প্রজ্ঞাবলে এই শাস্ত্রত্রয়ের ব্যাখ্যা হইতে মহদর্থ গ্রহণ করিতে পারেন।

কপিলের ভক্ত হইলেও, সর্ব্বথা সাংখ্যদর্শনের পক্ষপাতী হইতে হইবে, এমন নহে। সাংখ্যদর্শনসম্মত ৪, ৫, ৬, ৯, ২৫ ইত্যাদি সংখ্যার তত্ত্ব গণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে

প্রাপ্তে শমদমেঽপ্যেতিবাদস্তমনুশাম্যতি। ১১।২২।৫

আত্মমতের গর্ব্ব করিয়া লোক বিবাদতৎপর হয়। কিন্তু শমদমান্বিত লোকের তাদৃশ অভিমানাদি থাকে না; সুতরাং বিবাদ প্রশমিত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানে এই কথা পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে যে অভিমান ত্যাগ করিবে। অভিমানে ইন্দ্রিয় প্রবল হয়। তাহাতে আসুর স্বভাব অর্থাৎ বিবাদ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রিয় দমনে যত্ন ব্যতিরেকে কেহ পরমাত্মার উপাসনার যোগ্য হইতে পারে না।

পূর্ব্বের উল্লিখিত নানা মতের জটিলতা হেতু মহাভারত উপদেশ দিয়াছেন যে শাস্ত্রকে দূরে রাখিয়া মহাজনের পন্থা ধরিয়া চল। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অন্য কথা বলেন :—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রং॥

শাস্ত্র অনন্ত; মনুষ্যের জীবনকাল অল্প; শাস্ত্ররাশির অন্তর্নিহিত সমুদায় বেদ্যবস্তুর মর্ম্ম গ্রহণ করা আবশ্যক; অতএব যাহা সারভূত, তাহারই ভজনা করিবে। দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলে হংস যেমন জল বাছিয়া দুগ্ধ পান করে, তেমনি শাস্ত্রান্তর্গত সারবস্তু গ্রহণ করিবে।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা ঐ প্রকার শাস্ত্রীয় সারসংগ্রহ মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সনাতন ধর্ম্মোদ্দীপক। ব্রাহ্মসমাজে যে উপাসনা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে; তাহাতে মহাপ্রাণ ঋষিবাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের মিলন হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন, তাঁহারা এই আপত্তি করেন যে দেহবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে দেহধারী দেবতার আরাধনাই প্রশস্ত; তাহারা দেহাতীত অর্থাৎ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারে না।

আমাদের শরীর সাকার বটে; কিন্তু আত্মা নিরাকার; এই নিরাকার বস্তু বেদ্য;—এই বলিয়া উক্ত আপত্তির খণ্ডন করা গিয়াছিল। সেইমতে ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি এই অশীতিবর্ষ কাল চলিয়া আসিতেছে। গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহারা আমার মানুষী

তনু ভাবিতে থাকে, তাহারা আমায় অবজ্ঞা করে ; আমার অব্যয় নিত্য পরম ভাব তাহাদের হৃদ্গত হয় না। * এই বাক্য যে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানিবেন, তাঁহারা পরম শান্তি পাইবেন। তত্ত্বজ্ঞান বিনা উদ্ধার নাই ; প্রত্যুত পতন বা পুনরাবর্ত্তন ঘটে। † মনের চঞ্চলতা হেতু তাঁহাকে এক-নিষ্ঠ করা কঠিন হয়। ইহা স্বীকার করিয়া গীতা বলেন,—তদুপযোগী অভ্যাস ও বৈরাগ্য আবশ্যক। ‡ শ্রীমদ্ভাগবতেরও উপদেশ এই যে প্রথমে স্থূলরূপে চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়া ক্রমে সূক্ষ্মস্বরূপে প্রবেশ করিবে। § এই গ্রন্থের মতে ঈশ্বরের যে স্থূল শরীর, তাহা এই বাহ্য প্রকৃতি।¶

খং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ
জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশো দ্রুমাদীন্।
সরিৎ সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং
যৎকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনন্যঃ॥ ১১।২।৪০ ‖

---

* গীতা ৭।২৪।২৫, † ৯ অধ্যায় ১১ ২৪। ৪—৫৮। ৫ ১৭
‡ গীতা—৬ ; ২৬, ৩৫। ৮ ; ৮।
§ ৫ স্কন্ধ ২৬ অধ্যায় ৩৮। ¶ শ্রীমদ্ভাগবত ৫।২৬।৪৯।৫০
‖ ১১ স্কন্ধ ২ অধ্যায় ৪০ শ্লোক। ৪৯, ৫০

চন্দ্র সূর্য্য এই বিরাটপুরুষ বা বিশ্বরূপের চক্ষু। এই বাক্যে এমন বুঝাইবে না যে আমরাই তাঁহাকে দেখি; পরন্তু ইহার তাৎপর্য্য যে তিনি দিবারাত্রি আমাদিগের অন্তর্বাহ্য দর্শন করিতেছেন।

এইরূপে যখন মনুষ্য ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখেন, এবং ঈশ্বর আমাদিগের সমস্ত কার্য্য দর্শন করিতেছেন, এমন অনুভব করেন, তখন আর তাহার কোন স্থূল রূপ বা মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিবার প্রয়োজন হয় না। তখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সরল পথে প্রসারিত হয়। *

ব্রাহ্মসমাজ বলিলেন, নাস্তিক হওয়া অপেক্ষা অন্য যে কোন বিধানে হয়, ঈশ্বরের ভজনা করিলে তাহা শ্রেয়স্কর হইবে। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা যদি যথার্থ ঈশ্বরারাধনায় বাধা উৎপাদন করে, তবে সেই বাধকতার অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।

জলে স্থলে অনলে এবং ঘটে পটে ও প্রতিমায় যে ঈশ্বর-বুদ্ধি, শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃপুনঃ তাহার নিন্দাবাদ করিয়া-

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ২।২।১৪।

ছেন। * প্রধান দোষ এই যে উক্ত প্রকার উপাসনায় আমরাই ঈশ্বর দর্শন করি ; ঈশ্বর আমাদিগের অন্তর্বাহ্য দেখিতেছেন, এমন প্রতীতি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতে এমনও নির্ণয় হইয়াছে যে মূর্ত্তিপূজা ত্রেতাযুগে আরম্ভ হইয়াছিল। যাহারা পরস্পরকে অবজ্ঞা করিত, সেই বিবাদতৎপর লোকদিগকে ঈশ্বরার্চ্চনায় বিনত করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতেরা তাহাদের গ্রহণোপযোগী প্রতিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন এই অনুশাসন ছিল যে লোকবিদ্বেষী জনগণের পূজা ফলপ্রদ হইবে না। †

উত্তরকালে বিবাদ প্রশমনের নিমিত্ত উক্ত প্রকার কোন অনুশাসন বলবৎ রহিল না ; অথচ কলিযুগের শক্তি হ্রাসের অনুযায়ী প্রতিমা পূজার সুগমতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার বোধ ও তাঁহার উপাসনা প্রবৃত্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিয়াছে

---

* ১০ স্কন্ধ ৮৪ অধ্যায়—৭, ৯

† দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাত্মতাং নৃপ।
ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কবিভিঃ কৃতা।
ততোঽর্চ্চায়াং হরিং কেচিৎ সং শ্রদ্ধায় সপর্যয়া।
উপাসত উপস্তাপি নার্থদা পুরুষদ্বিষাং ॥ ৭।১৪।৩৩, ৩৪

এবং উহার পরিপন্থী রাগদ্বেষেরই অধিকার বৃদ্ধি পাইতেছে। *

খৃষ্টানদিগের পূর্ব্ব পুরুষ য়িহুদিরা যখন অন্য দেবতার উদ্দেশে ধূপ ও বলি প্রদান করিত, ঈশ্বর তাহা সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের আচারের দুষ্টতা ও কুৎসিত ক্রিয়া ঈশ্বরের অসহনীয় হইল। পূজোপহারের ক্রটিতে নয়—কিন্তু পাপাচরণে তাহারা দণ্ডনীয় হইয়াছিল। †

এই ধর্ম্মের সংশোধন চেষ্টায় খৃষ্টের এই উপদেশ ছিল ঃ—যদি নৈবেদ্য আনিয়া থাক, তাহা চক্রবেদির সম্মুখে রাখ ; ফিরিয়া যাও ; তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা থাকিলে অগ্রে তাহার মীমাংসা কর, পরে আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।‡

স্বদেশে এবং বিদেশে এই সকল সনাতন ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজ যাগযজ্ঞ ও প্রতিমাপূজাদির বাহ্য আড়ম্বরের অবকাশ রাখিলেন না। তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, এবং বিশুদ্ধ চিত্তে পবিত্র পরমেশ্ব-

---

* গীতা—৩।৩৪

† যিশায়াহ—৪৩ ; ২৪, ২৫। রোমীয় ২ ; ২২ খিরমিয় ৪৪ ; ২১, ২২। ‡ মথি ৫ ; ২৪

রের উপাসনার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্ন রহিল। হিংসাদ্বেষাদি ঈশ্বরারাধনার বাধক সমস্তই পরিহার্য্য হইল।

সর্ব্ব প্রকার অশান্তির মূল পাপ; পাপের মূল "অহং মম" প্রসক্তি। এই মূল উৎখাত করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—যেমন দেহে অহং বুদ্ধি থাকিবে না, তেমনি পুত্রকলত্রাদিতে মমতার প্রসক্তি থাকিবে না; তেমনি প্রতিমাতেও ঈশ্বরার্চ্চনা হইবে না। *

ব্রাহ্মসমাজের উপদেষ্টা যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ ধরিয়া নিঃসঙ্কল্পে বহির্ব্যাপারের চেষ্টা করিতে বলিয়াছেনঃ—

বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥

শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে নারদ মুনি যুধিষ্ঠিরের নিকট গার্হস্থ্যধর্ম্ম বিবরণে সেই কথা বলিয়াছেন—

গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥ ৭।১৪।১

গৃহে থাকিয়া যথোচিত ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিবে; তৎসমুদায় সাক্ষাৎ বাসুদেবে অর্পণ করিবে এবং মুনিদিগের সেবা করিবে।

এ স্থলে যে বাসুদেবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কথিত হইয়াছে,

* যস্যাত্ম বুদ্ধিঃ কুণ সে ত্রিধাতুকে—১০।৮৪।১৩

সেই বাসুদেব বিশ্বে বিরাজমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্যামী, নিত্য, সত্য পরমাত্মা। মনুষ্য সকল কার্য্যে সেই নিয়ন্তার হস্ত দেখিবে; সেই হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে। রামমোহন রায় যে ব্রহ্মোপাসনার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন—তাহাতে ঈশ্বরকে আমাদের সর্ব্ব কার্য্যে দ্রষ্টা স্বরূপে চিন্তা করা বিহিত হইয়াছে।

বেদান্তমতে—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,
গীতামতে—বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি,
শ্রীমদ্ভাগবতের মতে—সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং—

এই তিন বাক্যই একার্থবাচী; ব্রাহ্মসমাজ একনিষ্ঠায় তদন্তর্গত পরমতত্ত্বের চিন্তা করিতে থাকিবেন। চিরদিন এই প্রার্থনা থাকিবে ঃ—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং-গময় ;—

শাস্ত্রার্থ বোধের নিমিত্ত আমাদের এই প্রার্থনা ঃ—

তং ত্বামহং দেববরং বরেণ্যং
প্রপদ্য ঈশ প্রতিবোধনায়।
ছিন্দ্ধ্যর্থদীপৈ র্ভগবন্ বচোভি
গ্রন্থীন্ হৃদয্যান্ বিবৃণু স্বমোকঃ। ভাঃ ৮।২৪।৩২

শাস্ত্রার্থ গ্রহণ

সবাকার প্রিয় তুমি সুহৃদ ঈশ্বর।
তুমি আত্মা তুমি গুরু জ্ঞানের সাগর॥

নিজ বোধ হেতু প্রভু তোমার চরণে।
শরণ পশিনু মুই আনন্দিত মনে॥

ঘুচাইয়া দেহ প্রভু হৃদয় সংশয়।
তব বাক্যদীপে তমঃ ঘুচিবে নিশ্চয়॥

নিজ পাদদ্বন্দ্বসরোরুহে দেহ স্থান।
পতিত জনেরে ভবে হৈতে কর ত্রাণ॥

চতুর্থ প্রবন্ধ।

বেদান্তোদিত ধর্ম্ম।

গীতাভাষ্যে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রথমে এই তত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আদি বিধাতা জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির অভিপ্রায়ে মরীচ্যাদি প্রজাপতি সকলের সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তি লক্ষণের ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলেন। তৎপরে সনকাদি ঋষির উৎপত্তি হইল; তাঁহারা জ্ঞান-বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তিমার্গের পথিক হইলেন। এইরূপে শঙ্করের মতে আদিকাল অবধি জ্ঞান ও কর্ম্মের দুই পথে মনুষ্যের ধর্ম্মসাধনা হইতেছে। প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম জগতের স্থিতির কারণ, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম লোকদিগের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের হেতুভূত। সেই গীতার তাৎপর্য্য বিচারে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে কেবল তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়; কর্ম্মসমুচ্চয়ে তাহা হয় না।

যদিচ গীতার প্রবৃত্তিলক্ষণান্বিত কর্ম্মসকলকে "অত্যাজ্য" বলা হইয়াছে; কিন্তু উক্ত ঔপনিষদিক গ্রন্থ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বা অধ্যাত্ম বিদ্যারই মাহাত্ম্য বিস্তার হই-

আছে। এই জগতের মধ্যে ভগবানের উজ্জ্বল সত্তা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার যে বিভূতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আছে,—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।" বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা। তবে কি ভূবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা অথবা শব্দবিদ্যা, এতাবদ্ বিদ্যা ঈশ্বরবর্জ্জিত ? তাহা নহে। সর্ব্বব্যাপী হইলেও যেমন জগতের আদ্যন্তমধ্যে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ,—

"অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ।" ১০।২০

সকল বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা তদ্রূপ।

অধ্যাত্মবিদ্যাই মোক্ষের কারণ। এই মোক্ষ কি ? বৌদ্ধশাস্ত্রমতে মনুষ্যের সকল দুঃখ ক্লেশের সহিত নিজের অস্তিত্বলোপ হওয়া আবশ্যক। তাহার নাম নির্ব্বাণ। নিরীশ্বর বৌদ্ধমতের প্রতিবাদে ব্রহ্মণ্য স্থাপনের চেষ্টা হয়। তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকেই মোক্ষ বলা হইয়াছে। তাহার নাম তন্ত্রমতে মহানির্ব্বাণ অথবা গীতা মতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ। গীতা মতে মোক্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ আছে। অশুভ, পাপ ও ক্লেশ হইতে মোচন গীতোক্ত মোক্ষের স্পষ্টার্থ। কর্ম্মবন্ধন সবিশেষ বিচার্য্য। তাহা

হইতে এই দুঃখালয় সংসারে পুনঃপুনঃ গতি হয়। তাহার নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। পরমাগতি, পরমস্থান, পরমাশান্তি, উহার অন্য অর্থ। অন্ধকারময় রজনীর প্রভাতে আলোকময় দিবা দর্শন হয়। জ্ঞানের চরমোৎকর্ষে সেইরূপ মৃত্যুময় সংসারের পারে অমৃতত্ব প্রাপ্তি হইবে। অব্যক্ত হইতে আরো অব্যক্তে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে গতি হইবে; এই দুঃখময় সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না; অপর লভনীয় কিছু থাকিবে না; এইমাত্র বাক্যে মোক্ষ নির্দ্দেশ হইল। (৮ অ, ২০, ২১) এই প্রকারে ব্রহ্মপ্রাপ্তি গীতা গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

এই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব শাস্ত্রশরীরের মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই তত্ত্ব আশ্রয় করিলে শাস্ত্র সকলের মতবিরোধ মীমাংসিত হয়। এই তত্ত্বে উপনীত হইলে সংশয় ও কুতর্ক সমস্ত নিরস্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় রামচরিতে ঐরূপ আত্মতত্ত্বের দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অধ্যাত্মরামায়ণকার বলিলেন—

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ মুদেষ্যতি।
তাবৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরং॥

দর্শন শাস্ত্রের বিচারে জীব কি, জীবের সুখ দুঃখ কেন

হয়, এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরই বা কেমন,—এতাবৎ বিষয়ের বিবিধ তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। মানবজীবনের জরামরণাদি ক্লেশ-পরম্পরা দর্শন করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ দুঃখের প্রশমন উদ্দেশে দর্শন শাস্ত্রে বহু বিচার হইয়াছে। সেই বিচারের লক্ষ্য এই যে কিসে মনুষ্যের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মঙ্গল—অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন হয়। এ বিষয়ে দর্শন-প্রধান সাংখ্য এবং যোগ শাস্ত্রের অবলম্বনে গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, মরণশীল এই তাবৎ চরাচর সৃষ্টির মধ্যে অমরণশীল যে সনাতন পুরুষ নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার সত্তায় আত্মসমর্পণ করিলে সেই ঈশ্বর যোগক্ষেম সিদ্ধ করিয়া দেন্। (১৩ অ, ২৫। ৯ অ, ২২) ইহাতে মানবজীবন সর্ব্বাংশে চরিতার্থ হয়।

ভারতের সুবিচারিত দার্শনিক মতের উহাই সার। উহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এই মতে ঈশ্বরোপাসনায় আত্মা সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্ত হয়। এই বিশ্বাসে পণ্ডিতেরা বেদান্ত শাস্ত্রকে পরমার্থবোধের গুরু বলিয়া সম্মান করেন।

অধ্রুবের মধ্যে ধ্রুবের অন্বেষণে, সবিকল্পের মধ্যে

নির্ব্বিকল্পের সমাধানে, এবং অনেকের মধ্যে একত্বের স্থাপনে দার্শনিকদিগের বাদানুবাদ এবং কূটতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। যদি চ উক্ত বিচারে নানা মত-বৈষম্য উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সকাম পূজা অপেক্ষা নিষ্কাম উপাসনার মাহাত্ম্য সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনুষ্যের হৃদয়াধিকার করে। তৎপ্রযুক্ত ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যা দেশদেশান্তরে প্রচারিত ও পরিগৃহীত হইয়াছে।

এরিষ্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতগণ জন্মান্তরবাদ ও অন্যান্য দার্শনিক মতে এ দেশীয় জ্ঞানীদিগের সমবিশ্বাসী ছিলেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারের সময় দেখা গিয়াছিল, এপিকিউরস্ ও ষ্টোয়িক মতের সংশয়বাদিগণ যখন দর্শনশাস্ত্রঘটিত বিতণ্ডা-তৎপর ছিলেন, তখনও "মার" পর্ব্বতে অব্যক্ত অগোচর ঈশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

পৌল বলিয়াছিলেন, সর্ব্বজাতীয় মনুষ্য নানা পথে ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছে, যেন কোন মতে তাঁহার উদ্দেশ পায়। পরন্তু আত্মজ্ঞানেই† এই অব্যক্ত ঈশ্বর

* Act. XVII, 22, 23. † Luke XVII, 21.

চিন্তনীয় হয়েন। বস্তুত আমরা কি? জগতের স্রষ্টা সেই ঈশ্বরেই আমাদের জীবন গতি ও সত্তা। অস্মদ্দেশীয় শঙ্করাদি আচার্য্যগণের ন্যায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারক পৌল নানা-স্থানে বহুলোকের সহিত বিচারে এই তত্ত্ব স্থাপন করিয়া-ছেন যে আমাদের শরীর ঈশ্বরের মন্দির। † ইহার মধ্যে যিনি বিরাজ করিতেছেন, তিনি চক্ষু ও কর্ণের অগো-চর। তিনি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক। অধ্যাত্মযোগেই তিনি পরিজ্ঞাত হয়েন।‡

যিহুদাদেশের জ্ঞানার্থী লোকেরা পূর্ব্বদিকে সমুজ্জ্বল শুভ নক্ষত্র দর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আরো পূর্ব্বে থাকিয়া পশ্চিমদিকে প্রকাশিত সেই নক্ষত্রকে দেখিতেছি।

অশুভ হইতে, পাপ হইতে যে মুক্তি লাভ হয়, তাহারই সাধনা কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান সেই মুক্তির নিদান। "আমি আছি" ইহা বেদসার পুরুষসূক্ত। পশ্চিম দেশেও "আমি আছি"—এই ভগবদ্‌বাণী। আদিকাল অবধি এই বীজভূত শ্রুতিবাক্যের অর্থ-বিস্তার নানা ইতিহাসে নানা প্রকরণে ব্যক্ত হইতেছে।

তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে যেমন বিদ্যুদ্দর্শন হয়, তদ্রূপই

‡ 1. Corinth II. 2. Corinth. VI. 16.

ঐ আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি। বিশুদ্ধসত্ত্বে ঐ জ্ঞানের উদয় হয়। কখন কখন পাপতিমির ঘোররূপ ধারণ করে। তাহাতে ঐ আত্মজ্ঞান আবৃত হইয়া পড়ে। তাহার নিরাকরণ নিমিত্ত ধর্ম্মবক্তাদিগের আবির্ভাব ও তাঁহাদের তপস্যার তুল্য কঠিন কার্য্য আবশ্যক হয়।

খৃষ্ট এবং পৌল আত্মজ্ঞান সিদ্ধ যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা কতক উপধর্ম্মে জড়িত ছিল। উত্তরকালে সেই উপধর্ম্ম ভাগ বর্দ্ধিত হইলে ঐ বিশুদ্ধ ধর্ম্মও জনসমাজে বিষম বিরোধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে খৃষ্টের শাসিত পাপ-পুরুষ একবারে বিতাড়িত হয় নাই। তাহার দমন পক্ষে আরো বহু যুগের তপস্যা আবশ্যক।

গীতা গ্রন্থে এই পাপ পুরুষের দমন নিমিত্ত সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের বিচার দ্বারা দেবাসুর প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ও ঐ গুণত্রয়ের যথার্থ পরিচয় প্রথম আবশ্যক বিবেচনা হইয়াছে।

বাইবেলে এক পৌত্তলিকতা বা মূর্ত্তিপূজাকে বহু পাপের সহিত তুল্য এবং নরকের মূল বলিয়া ঘৃণা করা হইয়াছে। এক-ঈশ্বরবাদ মূলক খৃষ্টানধর্ম্মের উহাই বিশিষ্টতা। মুসল-

মানী ধর্ম্ম আবার সেই খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদেরও কোন কোন দোষ উৎখাত করেন। এই বিরোধ বশতঃ মুসলমানগণ মূর্ত্তিপূজার অধিকতর প্রতিপক্ষ।

এই বিদ্বেষবশতঃ মুসলমানেরা ভারতের সর্ব্বাধিপতি হইয়াও অধিবাসীদিগের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। পাঠানদিগের রাজত্বকালে ভারতীয় প্রজাগণ এই বিদ্বেষপ্রসূত মনোমালিন্যে কালযাপন করিয়াছিলেন।

অতঃপর মোগলসাম্রাজ্যের পত্তন হইল। তখন এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমান প্রজাকুল পরস্পর বন্ধুভাবে বাস করিয়াছিলেন। এই সদ্ভাবের মূল উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য সমদর্শনাত্মক ব্রহ্মজ্ঞান।

ইতিহাসে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে মোগলকুল-তিলক সম্রাট আকবর বেদান্তশাস্ত্রের মর্য্যাদা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি উপনিষৎ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত করেন। তাঁহার সভায় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ সমাদৃত হইতেন।* বেদান্তোদিত পরব্রহ্মের তত্ত্বালোচনায় আকবর সাহের ইহা অবশ্য প্রতীতি হইয়াছিল যে তাঁহার

* গীতার এক টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী আকবর সাহের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু প্রজাগণ "বুৎপরস্ত" পুত্তলিকার পূজক নহে ; "এক-মেবাদ্বিতীয়ং" মন্ত্র হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জপ্য। এই প্রত্যয় দৃঢ় হইলে সেই মহাজন মহীপতি যেমন মুসলমান দিগের, তেমনি হিন্দুদিগের সমান প্রিয় ও হিতসাধক হইতে পারিয়াছিলেন। যেমন রাজ্যবিস্তারে তেমনি প্রজাবাৎ-সল্যের গভীরতায়,—দুই প্রভাবে সম্রাট্ আকবর এদেশের পূজাস্পদ হইয়া গিয়াছেন। এই প্রকারে ভারতীয় ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা নির্বৈর ও সমদর্শনের ভাব, যতদূর সম্ভব, মুসল-মান হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে।

যখন ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হয়, তখন এ দেশে পারস্য ও আরব্য ভাষার বহু প্রচার হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসল-মান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এক মক্তবে সেখ সাদির গ্রন্থে এই ঈশ্বরোক্তি পাঠ করিতেন—

"ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা ও পাতা। তিনিই জিহ্বাকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিয়াছেন।

যিনি তাঁহার প্রতি বিমুখ, তিনি সম্মানের যোগ্য নহেন।

পৃথিবীর সমস্ত রাজা তাঁহার সমক্ষে অবনত মস্তকে প্রার্থনা করে।

যাহারা তাঁর বিদ্রোহী, তাহাদিগকে তিনি অচিরে বিনাশ করেন না ; যাহারা অনুতাপী তাহাদিগকে তিনি তাড়াইয়া দেন না। এই যে দুই পৃথিবী তাহা তাঁহার জ্ঞানসমুদ্রের কণামাত্র।

যাহারা পাপী তাহাদিগকে তিনি তাঁহার প্রাচুর্য্য হইতে বঞ্চিত করেন না। ধরাপৃষ্ঠে তিনি তাঁহার সদাব্রত এমন ভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে শত্রু মিত্র উভয়েই তাহা সম্ভোগ করিতে পারে।

অতুল্য তিনি এবং তাঁহার রাজত্ব অনন্তকাল স্থায়ী। এক জনের মস্তকে তিনি রাজমুকুট পরাইতেছেন, অপরকে তিনি সিংহাসন হইতে বিলুণ্ঠিত করিতেছেন।

তিনি তাঁহার বন্ধুর ক্রোধাগ্নিকে কুসুমে পরিণত করেন। নাইল নদের ভিতর দিয়া তিনি তাঁহার শত্রুগণকে বিনষ্ট করেন।

আবরণ ভেদ করিয়া তিনি দেখিতেছেন। এবং আপনার মহত্বে তিনি আমাদের সকল দোষ ঢাকিয়া দিতেছেন। যাহারা অবনত তাহাদের তিনি নিকটে; যাহারা অনুতাপী তাহাদের প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন।

যাহা নাই তাহাও তিনি জানিতেছেন। যাহা বলা হয় নাই, তাহাও তিনি বুঝিতেছেন।

তিনি চন্দ্র সূর্য্যকে বিঘূর্ণিত করিতেছেন। ধরাপৃষ্ঠে তিনি জলসিঞ্চন করিতেছেন।

প্রস্তরের অভ্যন্তরে তিনি মণিমাণিক্য নিহিত করিয়া দিয়াছেন। কিছুই ছিল না; তাহার ভিতর হইতে তিনি সকলই সৃষ্টি করিলেন।

কে তাঁর মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারে? কোন্ চক্ষু তাঁহার

সৌন্দর্য্যের :সীমায় পৌঁছিতে পারে? চিন্তাপক্ষী তাঁহার স্বরূপের নিকট পৌঁছিতে পারে না। জ্ঞানের হস্ত তাঁহার মহিমার প্রান্ত-দেশও স্পর্শ করিতে পারে না।"

এই মতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুফী সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা অনেকাংশে বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞানীর সমধর্ম্মী হইয়াছেন।

যে সকল ব্যক্তি পঠদ্দশায় সাদি কবির উপরি উক্ত কবিতা পাঠ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা ধর্ম্মালোচনায় বৈদান্তিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধতর প্রভাব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অতি আগ্রহে রামগীতা, ভগবদ্‌গীতা প্রভৃতি বেদান্ত-সম্মত গ্রন্থের সেবা করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া গীতা ও তাহার মাতৃস্বরূপা উপনিষৎ পাঠ দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করাতে তাঁহাদের কত আনন্দ জন্মিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের আট বৎসর পূর্ব্বে ইহার সংস্থাপক রামমোহন রায় যীশুখৃষ্টের উপদেশ সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক অনুবাদ সমেত মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বঙ্গীয় ভাষায় খৃষ্টের উপদেশ প্রচার করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ সকল সারগর্ভ উপদেশ এতদ্দেশীয় লোকের সুবিদিত হয় এবং তদ্দারা এদেশের লোকের সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত

হয়। এই সকল উপদেশ নীতিশাস্ত্রসম্মত। তাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুশাসন প্রকাশ পায়।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মধ্যে যে ঐশ্বরিক ত্রিত্ব-বিচার আছে, তাহা অস্বাভাবিক। সেই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত কোন দেশে সহজে পরিগৃহীত হয় নাই। এ দেশে উহা একবারে অবজ্ঞাত না হয়, প্রত্যুত উহার অন্তর্গত সার সত্য অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেরও উন্নতিসাধক হইতে পারে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক ঐ সকল উপদেশ সঙ্কলিত হইয়াছিল। পরে ঐ বিষয়ে খৃষ্টীয় মিশনরীদিগের সহিত বহু বিচার চলিয়াছিল।

যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের বিচারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ বিষয়ক কঠিন সমস্যা পূরণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে যীশু খৃষ্টের পুত্রত্ব, ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং সেই পিতাপুত্রের ভেদাভেদ সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা কঠিন নহে।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা জানিলেন, অন্য দেশ প্রচারিত ধর্ম্মের উপর বেদান্তোদিত ধর্ম্মের কত প্রভাব। ইহাতে তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি অটল নিষ্ঠা জন্মিয়াছিল। অথচ "বণী আদম একরা" ইত্যাদি পারসী বাক্যের সহিত তাঁহারা সকল ধর্ম্মাবলম্বী জনগণের প্রতি প্রেমবাহু বিস্তার

করিতে পারিতেন। ইহাতে সেই প্রথম সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে সদ্ভাবের আনন্দ অনুভব হইত, তাহা নানা ঘটনার মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে।

পঞ্চম প্রবন্ধ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

বৈদিক বর্ণাশ্রমাচার মতে মনুষ্যের প্রথম বয়সে ব্রহ্মচর্য্য-এবং শেষ বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিধান আছে। প্রথম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল ব্রতাচরণ করিতে হয়, তাহাতে শেষ বয়সের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন কতক অভ্যস্ত হইয়া থাকে। বেদ-বেদান্ত পাঠ এবং তপোনিষ্ঠা দ্বারা যাহার বিষয়-বাসনা ক্ষয় হয়, তিনি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ না করিয়া সেই ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই জীবনকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। এমন ব্যক্তিকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়।

এই আশ্রমবিধানে সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা প্রকাশ পায়। গীতা গ্রন্থে ভগবদ্বিভূতি বিচারে চতুরাশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এই দুই মার্গ নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি মার্গে সহজে মনুষ্যের গতি হয়। নিবৃত্তি মার্গের গতি সাধন-সাপেক্ষ।

পরন্তু বৌদ্ধভিক্ষুদিগের প্রভাবকাল অবধি বহুলোককে নিবৃত্তিপথে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। ক্রমশঃ তাহা-দের দণ্ডধারণাদি যতিচিহ্ন ছলমাত্র হইয়া আসিলে শাস্ত্র-

কারেরা ঐ সন্ন্যাস অবলম্বনের প্রশ্রয়কে খর্ব্ব করিতে বাধ্য হইলেন।

তৎপরে সাধারণতঃ এই নিয়ম হইয়াছে যে অনাশ্রমী হইয়া থাকিতে পারিবে না ; গুরুর অনুমতি লইয়া বিধি-পূর্ব্বক এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে ; ক্ষণমাত্র যেন আশ্রমবিরহিত অবস্থা না ঘটে।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে ঋণত্রয় পরিশোধ করিতে হইবে। দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, এবং মনুষ্য-ঋণ। এই ঋণত্রয় শোধ না করিয়া যিনি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবেন, তাঁহাকে অধোগামী হইতে হইবে (মনু ৬ ; ৩৫)। মনুসংহিতায় ব্রতবিহীন এবং চিহ্নমাত্রধারী ব্রাহ্মণাদির সবিশেষ নিন্দাবাদ আছে।*

পুরাণে এমন উপাখ্যান আছে যে, প্রজাবৃদ্ধির উদ্দেশে জাত হইয়া অনেক ব্যক্তি যতিবেশে নিবৃত্তিমার্গে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের উপদেষ্টার সহিত নিন্দাভাজন হইয়াছেন।† শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে আশ্রমধর্ম্মের যে বিধান বলা হইয়াছে, শ্রীধরস্বামী তাহার এক শ্লোকের এই ব্যাখ্যা করেন,—

* মনু ৬ ; ৩৫।

† ভাগবত ৬।৫।৩০

ব্রহ্মচারী যদি সকাম হয়েন, তবে গৃহস্থ হইবেন; যদি নিষ্কাম হয়েন, তবে বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবেন। যদি শুদ্ধচিত্ত হয়েন, তবে প্রব্রজ্যায় গমন করিবেন। গীতা-গ্রন্থে অর্জ্জুনকে লোকসংস্থিতির উদ্দেশে জনকাদি ঋষির ন্যায় কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফলতঃ ঋণত্রয়ের পরিশোধরূপ পরম ধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়। উহা লোকসংস্থিতির পক্ষে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। উহাতে পরমার্থ চেষ্টা সুগম হয়, মোক্ষলাভ নিকট হইয়া আইসে। উহাকে চতুর্ব্বর্গ সাধন বলা যায়।

অধ্যাত্মরামায়ণান্তর্গত রামগীতায় ঐ চতুর্ব্বর্গ সাধনার স্পষ্ট বিধান আছে ঃ—

আদৌ সবর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিত-শুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনম্
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥

প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইবে। পূর্ব্বের বিহিত সাধনা যখন সম্পূর্ণ হইবে, তখন আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ জন্য সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে।

যখন শাস্ত্রার্থের এবম্বিধ প্রচার, তখন ব্রাহ্মসমাজের উদয় হইল।

বিধাতার নিগূঢ় বিধানে এক ভারতক্ষেত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত সভ্যজাতির ব্যবহারশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্র একত্র হইতেছে। ঐ সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতজনগণ এসিয়া (Asia) ভূভাগের এবং বিশেষ পক্ষে ভারতের শাস্ত্রাগার হইতে অমূল্য জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন।

সর্ব্বদেশের প্রচারিত ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব-বিচারে যেমন জ্ঞান মার্জ্জিত হয়; সর্ব্ব জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত মৈত্রীকরণে তেমনি হৃদয়ের প্রশস্ততা জন্মে। ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা সেই সুযোগের সম্যক্ ফলাহরণে তৎপর হইলেন। শ্রুতিশির শাস্ত্র সকলের আদ্যোপান্ত দর্শন দ্বারা উহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ হইলে বর্ণাশ্রম বিধানের এবং অপর সমস্ত ধর্ম্ম মতের সারোদ্ধার করা সহজ হইল।

ভারতের ব্রহ্মবিৎ যতি, তপস্বী, যোগী ও সন্ন্যাসীগণ জনসমাজের বহির্ভাগে বিচরণ করেন। মোক্ষমার্গের উৎকৃষ্ট সাধনা যদি লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া রহিল, তাহাতে জগতের মঙ্গল কি হইবে?

ব্রাহ্মসমাজ স্থির করিলেন, বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিদিগের পক্ষে যেমন ব্রহ্মোপাসনা বিহিত, বর্ণাশ্রমাচারের বহির্ভূত লোকদিগেরও তেমনি উহা প্রয়োজনীয়। ভগবান্ মনু চারিবর্ণের মনুষ্যদিগের যে সাধারণ ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ব মানবের সেবনীয়। চারি আশ্রমের পক্ষে যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা এক গৃহস্থ আশ্রমেই পালনীয় হয়। গৃহস্থগণ ব্রহ্মনিষ্ঠায় থাকিয়া যে ধর্ম্ম পালন করিবেন, তাহাতে তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভ হইবে এবং তদ্দারা মনুষ্য সমাজেরও পরম মঙ্গল হইবে।

মনুপ্রোক্ত ধর্ম্ম যখন ভৃগু কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, তখনকার এ দেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং উক্ত শাস্ত্র দ্বারা কিপ্রকার ধর্ম্মোদয় হইয়াছিল, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিতে হয়।

সবিশেষ আলোচনায় বিদিত হইবে যে উক্ত শাস্ত্র দ্বারা সন্ন্যাসধর্ম্ম ও গার্হস্থ্যধর্ম্মে সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সাধারণতঃ সন্ন্যাসাশ্রমের বিধানে যেমন অহিংসা, ইন্দ্রিয়-সংযম, এবং বেদান্ত চর্চ্চাদি ধর্ম্মের উপদেশ আছে, তেমনি বেদবিহিত নিত্যকর্ম্ম এবং উপবাস ও চান্দ্রা-

রণাদি ব্রতানুষ্ঠানেরও উপদেশ দেখা যায় (৬; ৭৬)। ধ্যান ও প্রাণায়াম এই আশ্রমের বিশেষ সাধনা (৬; ৭২)। এই বিধানানুগত কর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেও সম্ভব হয়। ব্রহ্মচারী যেমন উপনিষদাদি বেদাভ্যাস করিবেন, তেমনি তপস্যা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিবেন, এমন বিধান হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়সংযম এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রধান কর্ম্ম।

সন্ন্যাসীর পক্ষে উপদেশ এই যে পরের অপমানজনক বাক্য সহিয়া থাকিবে। কাহারও সহিত বৈরাচরণ করিবে না (৬।৪৭)। ব্রহ্মচারীর প্রতিও ঐরূপ অনুশাসন আছে—"অপরের দ্বারা পীড়িত হইলেও তাহাকে মর্ম্মপীড়াদায়ক কথা কহিবে না। পরদ্রোহ কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবে না" (মনু ২; ১৬০—১৬২)। মহাভারতে দেখা যায়, রাজা যযাতি স্বীয় আশীর্ব্বাদ-ভাজন পুত্র পুরুকে রাজ্য ভারার্পণ কালে এই ধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়াছিলেন :—

অক্রোধনঃ ক্রোধনেভ্যো বিশিষ্ট
স্তথা তিতিক্ষুরতিতিক্ষোর্বিশিষ্টঃ।
অমানুষেভ্যো মানুষাশ্চ প্রধানা
বিদ্বাংস্তথৈবাবিদুষঃ প্রধানঃ॥

আদিপর্ব্ব ৮৭ অধ্যায়।

ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাস, ইহার মধ্যভাগে গৃহস্থাশ্রম। গৃহী ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গের সাধক। গৃহস্থাশ্রমকে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে (৬; ৮৯)। প্রথমাশ্রমে যে সংযম শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিবার স্থল এই দ্বিতীয়াশ্রম। ব্রহ্মচারীর ইন্দ্রিয়সংযম অভ্যাসে যে চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তদ্বিনা বেদাধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, নিয়ম বা তপস্যা, কিছুই সিদ্ধ হইবে না। দণ্ডী বা ত্রিদণ্ডী শব্দ সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহস্থের পক্ষেই অধিক সঙ্গত হয়। কারণ, গৃহস্থাশ্রমেই কায় বাক্য ও মনের সংযম বা দণ্ড একান্ত আবশ্যক হয়। (মনু ১২; ১১)।

ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বিষয়ে প্রসক্ত হয়। তাহাদিগের ভোগের অবস্থায় নিত্য নিত্য সেই ভোগের নশ্বরতাদি জ্ঞান জাগরিত করা যায়। তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সাধন হইতে পারে। এইপ্রকার সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি, গৃহস্থ হউন বা যে কোন আশ্রমী হউন, বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ হইলে মোক্ষাধিকারী হইবেন। ইহাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত (মনু ১২; ১০২)।

নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষলাভের নিমিত্ত কি চাই? বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয় সংযম, অহিংসা এবং

গুরুসেবা (মনু ১২।৮৩)। এ সমস্তই গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্ন্যাসপ্রসঙ্গে কুটীচর নামক এক সম্প্রদায়ের বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহারা বেদোক্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন না। তাঁহারা ধৃতি ক্ষমা দম অচৌর্য্য শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ, এই দশ লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মের আচরণ করিতেন। (ইহাঁরা বৌদ্ধভিক্ষুদিগের অবশেষাংশ; হংস ও পরমহংসাদি নামে তাঁহারা পরিচিত হইতেন)। পূর্ব্বতন বানপ্রস্থদিগের ন্যায় শেষ বয়সে ইহাঁরা নিয়ত বেদাভ্যাস করিতেন এবং পুত্রের ঐশ্বর্য্যে সুখভোগে থাকিতেন।

এই কুটীচর সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণেরা উপরি উক্ত দশ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম পালন এবং বিধিপূর্ব্বক বেদান্ত শ্রবণ করিবেন; এই উদ্দেশে উক্ত দৃষ্টান্তের অবতারণা হইয়াছে।

কালে কালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের জয়পরাজয় এইরূপে পূর্ব্বাপর গণনা হইয়া আসিতেছে।

বিষয়ের সেবায় হঠাৎ বিরতি জন্মিলে তাহার আবার

বৈপরীত্য হওয়া বিচিত্র নহে। এই হেতু গৃহস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যে বানপ্রস্থাশ্রমে বিষয়ভোগ-বিরাগ অভ্যাস করিতে হয়। ক্রমশঃ সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হয়। এবম্বিধ সন্ন্যাস ও পরিব্রজন কর্ম্ম সাধুসম্মত হয়। ইহার অন্যথায় সন্ন্যাসের চিহ্ন মাত্র ধারণ করিয়া লোক যে ভিক্ষান্নে উদর পূর্ত্তি করে, শাস্ত্রে তাহার ভূয়সী নিন্দা করা হইয়াছে। "কতক" বৃক্ষের ফলের উদাহরণ দেখাইয়া মনু বলিয়াছেন,—এই নাম গ্রহণ দ্বারা জল পরিষ্কৃত হয় না, জলে নির্ম্মলী প্রদান করিতে হয়। তেমনি বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা কেবল বিচার ও জল্পনায় সুগতি লাভ হয় না (মনু ৬; ৬৭)।

সন্ন্যাসীর যেমন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি চিহ্ন থাকে, ব্রহ্মচারীরও তেমনি মস্তক মুণ্ডন, শিখা ধারণ, বা জটাবন্ধন এবং গৈরিক বসন বা কৌপীন দৃশ্যমান হয় (২; ২১৯)।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের তদ্রূপ কোন বিশিষ্ট চিহ্ন না থাকিলেও মৌঞ্জী মেখলা ও উপবীতাদি সাধারণ দ্বিজ-লক্ষণ থাকে। বেদাভ্যাস ও ব্রতাচরণের তারতম্যে উত্তম মধ্যম বিচার হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাভ্যাসই তপস্যা। বেদাভ্যাস দ্বারাই তাহার অনন্ত সুখ লাভ হয়। বেদাদি

শাস্ত্র রক্ষা হেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের "ঈশ্বর" বলিয়া মান্য হয়েন। এই হেতু যতির ভিক্ষাটনের ন্যায় ব্রাহ্মণেরও প্রতিগ্রহ ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঈদৃশ মর্য্যাদাবান্ ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মবর্জ্জিত হইলে তাহার বিষম ফল হয়।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ যতি হউন বা গৃহস্থ হউন, তিনি সকল বর্ণের গুরু। তিনি বিধাতা, শাসিতা এবং ধর্ম্মবক্তা। তিনি সর্ব্বভূতের মিত্র। জনসমাজের মস্তক স্বরূপ ঈদৃশ ব্রাহ্মণ দোষাশ্রিত হইলে লোকমঙ্গলের সমূহ ব্যাঘাত সম্ভাবনা হইবে। কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মময় মৃগ যেমন নামমাত্র সার, বেদাভ্যাস বিহীন ব্রাহ্মণ তেমনি নামমাত্র সার হয়। তাহার দ্বারা ধর্ম্মের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। (মনু ২।১৫৭)

এই হেতু ব্রাহ্মণগণকে ধর্ম্মের সেতু বলা হইয়াছে। লোকরক্ষার মূল শাস্ত্ররক্ষা। ধর্ম্মশাস্ত্র রক্ষাহেতু মনুর মতে ব্রাহ্মণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। মহাভারতে উহারই মহদ্-ব্যাখ্যান সর্ব্বাংশে উপলব্ধ হয়।

ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বলোকানাং মহান্তো ধর্ম্মসেতবঃ।
প্রণেতারশ্চ লোকানাং শাস্ত্রাণাঞ্চ যশস্বিনঃ॥

তপোযেষাং ধনং নিত্যং বাক্‌চৈব বিপুলং বলং।
যান্‌ সমাশ্রিত্য জীবন্তি প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৫১ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ অধর্ম্মাশ্রিত না হইতে পারে, এ নিমিত্ত বিবিধ অনুশাসন সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে।

ধর্ম্মধ্বজী, বিড়ালব্রতী, লুব্ধ ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধে বা অতিথি ভাবে অন্ন পাইলে তাহাদের তত্তদ্দোষ বর্দ্ধিত হইবে, অতএব তাহাদের সেই অন্নলাভের পক্ষেও বাধা দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মের ছলে পাপাচরণ না হয়, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শাস্ত্রকারদিগের দেখা যায়। উক্ত প্রকার চিহ্নমাত্রধারী ছলগ্রাহী ব্রাহ্মণেরা যে দোষাশ্রয় করিবেন, তাহার নিবারণের উপায় কি? তাহাদের বিচার কে করিবে?

এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—ব্রহ্মবাদীগণ ইহকালের ও পরকালের গতি দর্শাইয়া উক্ত দোষের প্রতিবিধান করিতে পারিবেন।

এমন ব্রহ্মবাদী কে? ধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, অধর্ম্ম, অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম—এ সকলের বিচার কে করিতে পারে? তেমন মহাপুরুষের লক্ষণ বা ইতিবৃত্ত যদি আদিম

শাস্ত্রে না পাওয়া যায়, তবে মনু এবং তাঁহার শিষ্য ভৃগুকেই সেই ব্রহ্মবাদী বলিতে হয়। পুরাণশাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ ব্রহ্মবাদীর সংসতে ধর্ম্মবিচার বিশ্রুত হয়।

মনুর পর যুগযুগান্তর গত হইল। পুরাণপ্রসঙ্গে কত দেশের কত লোকের ক্ষয় ও অভ্যুদয়ের বিবরণ জানা যায়। জনসমাজের মঙ্গলার্থ কত প্রকার ধর্ম্মশিক্ষা এবং তাহার উপায়ভূত সংঘ, সংসৎ ও সভার উদয় হইয়াছে। এইরূপে লোকসংস্থিতির প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। মনুষ্য-শক্তির তারতম্য হইলেও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সত্যের মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতের যখন কলিলক্ষণযুক্ত অধোগতি সর্ব্বাংশে দৃশ্যমান হইয়াছিল, এমন অবস্থায় ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা ব্রহ্মবাদী নামে পরিচিত হইতেছেন। এই উপাসকদের এমন শক্তি হইবে কি যে ইঁহারা পূর্ব্বতন পূজাস্পদ ব্রহ্মবাদীদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে থাকিবেন। দেব-ঋষি-পিতৃপুরুষদিগের ধর্ম্ম তাহাদের প্রকাশিত গ্রন্থে সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। নিত্য নিত্য তাহার অধ্যয়ন করা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

ঈশ্বরের প্রসাদ, পিতৃপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ এবং মনুষ্যগণের পরস্পর সুহৃদ্ভাব সমবেত হইলে সেই ঋষি-যজ্ঞ হইতে অমৃতময় মহাফল সমুদ্ভূত হইতে পারে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ।

ব্রাহ্মসমাজের মত কি ?

"ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলের আত্মাতে নিহিত আছে,"—এই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মব্যাখ্যা হয়। কিন্তু উহাতে মনুষ্যের সমস্ত ধর্ম্ম বুঝা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ কি করিবেন্, কি না করিবেন, এমন কোন লেখাপড়া আছে কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বাদশটী মত (creed) নির্দ্দেশ করা যায়।

যিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক বলিয়া মান্য, সেই মহাত্মা রামমোহন রায় উক্ত সমাজ স্থাপনের অল্পকাল পরে দ্বাদশটী প্রশ্নোত্তরে ইংরাজী ভাষায় উহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ" নামে আর একটী প্রবন্ধ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। উভয় প্রবন্ধের এক্ মর্ম্ম। ইংরাজী creed বাঙ্গালা ভাষায় "মত" বা "বিশ্বাস" শব্দে অনুবাদিত হইতে পারে। প্রশ্নোত্তরে যাহা সমাধান হইয়াছে, তাহাই নিম্নে সঙ্কলিত হইল :—

ব্রাহ্মসমাজের মত কি ?

১। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রতি অন্তরের ভক্তিকে তাহার উপাসনা বলা যায়।

২। যে বিধাতা বিশ্বসংসারের প্রত্যেক বস্তুকে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করাইতেছেন, তাঁহারই উপাসনা কর্ত্তব্য।

৩। ঈশ্বরের যে নিত্য স্বরূপ, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিতে বিদিত হয় না। এই জগতের অধীশ্বর ও পালনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নিরূপণ হয়।

৪। মনুষ্য এই দৃশ্যমান জগতের আকার ও তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হয়। যাঁহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইল, সেই অদৃশ্য অব্যয় পুরুষের স্বরূপ এই মনুষ্য কি প্রকারে নির্দ্দেশ করিবে ? তিনি বাক্য ও মনের অগোচর।

৫। সর্ব্বধর্ম্মে ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও পালনকর্ত্তা বলা হয়। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী কেহ নাই। যিনি বলেন দেশ কাল ও প্রকৃতির দ্বারা জগৎ চলিতেছে, তিনি এতদন্তর্গত এক শক্তিকে স্বীকার করেন। আমরা সেই শক্তিকে ঈশ্বর বলি। অতএব আমাদের সহিত কাহারো মতবিরোধ হয় না।

৬। ঈশ্বর নিত্য এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও জগত রচনায় প্রকাশিত জ্ঞান দ্বারা ইহার নিয়ন্তাকে জানা যায়। সেইরূপ শরীরের ক্রিয়া ও মানসিক ব্যাপার দর্শনে ইহার অন্তরাত্মা পুরুষের জ্ঞান হয়। এই বিচারে শাস্ত্র-সমন্বয় হয়।

৭। আমরা অন্য উপাসকদিগের কথনই বিরুদ্ধবাদী হইতে পারি না। কারণ, তাঁহারা যাঁহার আরাধনা করেন, তাঁহাকে জগতের সর্ব্বোপরিস্থ সনাতন কর্ত্তা পুরুষ বলিয়াই বিবেচনা করেন। সুতরাং আমাদের উপাসনায় তাঁহাদের সহিত এক-যোগ হইল।

৮। অন্য উপাসকদিগের সহিত যদি আমাদের মত-ভেদ থাকে, তাহার প্রকরণ এই—

তাঁহারা কোন কোন আকারে এবং কোন কোন স্থানে ঈশ্বরের পূজা করেন, আমরা বিশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করি।

পরধর্ম্মের প্রতি অন্য উপাসকদিগের যে দ্বেষ থাকে, আমাদের তাহা নাই।

৯। পরমেশ্বর এই দৃশ্যমান্ আশ্চর্য্যময় জগতের সমুদায় নিয়মিত করিতেছেন এবং তদ্দারা আত্মপ্রকাশ

করেন,—ইহার প্রণিধান করা, ইন্দ্রিয়প্রসক্তি এবং কাম-ক্রোধাদি রিপুর দমন করা, ন্যায় সত্য ও দয়ার অনুষ্ঠান করা,—এতদ্দ্বারা ঈশ্বরের পূজা হয়। সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও জল দ্বারা আমরা কত উপকার প্রাপ্ত হইতেছি; এই পৃথিবী বিবিধ শস্য উৎপাদন দ্বারা আমাদের কেমন পোষণ করিতেছে—এতাবদনুধ্যান দ্বারা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি জন্মে। ঈশ্বরোপাসনার এই প্রকরণ।

১০। যথেচ্ছাচার ত্যাগপূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত এবং যুক্তিসঙ্গত মিতাচারে আহার, পান এবং লৌকিক তাবৎ ব্যবহার করা সমুচিত।

১১। যে স্থানে এবং যে কালে পরমেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে এবং সেই কালে উপাসনা হইতে পারে।

১২। এই মতে সকল ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে পারা যায়। কিন্তু সেই উপদেশ গ্রহণের যোগ্যতানুসারে তাহার ফল হয়।

উক্ত মতগুলি লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সমুত্থিত হইয়াছেন। ইহার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ন্যায় কোন অলৌকিক ক্রিয়া বা অসাধারণ দৈববাণীর অপেক্ষা

ছিল না। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ইহার ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে। ইহাও স্মর্ত্তব্য যে খৃষ্টীয় বা মুসলমান ধর্ম্ম বহু বহু দৈব ঘটনা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। পরন্তু বহুকাল সেই দৈবী ঘটনা-বলীর অবসান হইয়াছে। যাঁহাদের কর্ত্তৃক সেই সকল অদ্ভুত ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা অল্পকাল পরেই পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছিলেন। পুনশ্চ সেরূপ ঐশী অবতারের সমাগম হইবে কি না, এবং তাঁহারা কিপ্রকারে পুনশ্চ ধর্ম্মস্থাপন করিবেন, তাহার নিশ্চয় কিছু নাই। তাঁহাদের প্রচারিত যে গ্রন্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐ ধর্ম্মাবলম্বীগণ সেই সেই গ্রন্থকেই দৈবশক্তি-সমুদ্ভূত অসা-ধারণ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতীয় বেদ-শাস্ত্রকেও ঐরূপ ঐশ্বরিক বাণী এবং অনাদি বস্তু বলা হইয়াছে। এখানে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বিচার হইবে যে, এক একখানি শাস্ত্রের যদি এমন প্রচার, তবে সেই শাস্ত্র সমষ্টি যেখানে সেবনীয় বলিয়া গৃহীত হইতেছে, সেই ব্রাহ্মসমাজের কত অসামান্য শক্তি নির্দ্দেশ হইতে পারে ?

অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মতভেদ

উক্ত দ্বাদশ সংখ্যক মতে যাহা বিদিত হয়, তদতিরিক্ত যদি কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা এই—

এই সমাজের উপাসকেরা শাস্ত্র, যুক্তি, সদাচার ও আত্মপ্রত্যয়, এই চতুর্ব্বিধ প্রমাণের কোনটীকেই অবজ্ঞা না করিয়া সনাতন ধর্ম্ম বিচার করিয়া লইবেন। এইরূপে যে ধর্ম্মাবধারণ হইবে, তাহা কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ হইবে না।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তালোচনা।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তালোচনা।

মাঘ মাসে বঙ্গদেশে নানা সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করিয়া থাকেন। ১১ই মাঘ দিবসে ব্রহ্মোৎসব বলিয়া পঞ্জিকাকারেরাও লিখেন। এই দিন ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপাসনা হয়। বহুলোকের জনতায় এবং সঙ্কীর্ত্তনাদির ঘটায় তাহা উৎসব আকার ধারণ করে। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা উপাসনা পদ্ধতি এবং পারিবারিক অনুষ্ঠান-পদ্ধতির বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিলেও ১১ মাঘ দিবসকে তাঁহারা সকলেই পবিত্র উৎসবের দিন মনে করেন। ঐ দিন দিবাভাগে এবং রাত্রি-কালে দুইবার উপাসনা হয়। মধ্যভাগে বা অপরাহ্ণে ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনা হয়। সমস্ত দিনব্যাপী এইপ্রকার ঈশ্বর-চিন্তা ও ব্রহ্মগীতি দ্বারা এই ১১ই মাঘের বিশিষ্টরূপ খ্যাতি সর্ব্বজনের গোচর হইতেছে।

এ বৎসর আদিব্রাহ্মসমাজের ঊনাশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব* উপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে উপদেশ প্রদান করেন তাহা কয়েকখানি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণিধান করিয়া জানিতেছি, এই উপদেশ বা বক্তৃতাতে ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের তথ্য

* ১৮৩০ শকের মাঘোৎসব।

মর্ম্মে মর্ম্মে রহিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রকরণে, সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য উপাসনা আরম্ভ হয়।* ১৭৫১ শকের ৬ই ভাদ্র তাহার সাম্বৎসরিক উপাসনা হইয়াছিল। তাহা ধরিলে বর্ত্তমান ১৮৩০ শকে যে উপাসনা হইল, তাহাকে অশীতি সাম্বৎসরিক গণনা করাই বিহিত হয়।

১৭৫০ শকের ভাদ্র হইতে দেড় বৎসরকাল এই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য অন্যত্র চলিতেছিল। ইত্যবসরে আদিব্রাহ্মসমাজের এই বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত হইলে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ দিবসে এই গৃহে প্রথম উপাসনা হয়। সেই দিনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠার দিবস বিবেচনা করিয়া সেই দিন হইতে ব্রাহ্ম সংবৎ গণ্য করা হইতেছে। তাহারই এই ঊনাশীতি বৎসর।

রামমোহন ১৭৫১ ও ১৭৫২ শকের ভাদ্র মাসে ভাড়াবাড়ীতেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সাম্বৎসরিক উৎসব করিয়াছিলেন। ১৭৫২ শকের অগ্রহায়ণ মাসে

---

* এই সময়কার ধর্ম্মব্যাখ্যান "আদিব্রাহ্মসমাজের" ব্যাখ্যান নামে এক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে ঐ সাম্বৎ-সরিক কৃত্য রহিত হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর পরে শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। বর্ষাকালে উৎসবের কার্য্য ভাল হয় না। অতএব সেই দুই সাম্বৎসরিকের মিলন করিয়া শীত ঋতুতে উৎসব করা অভিপ্রেত হইয়াছিল। এইরূপে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের ১৫ বৎসর পরে ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসের একাদশ দিবসে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের সাম্বৎসরিক উৎসব এক উদ্দেশে যুক্ত হইয়া নবোৎসাহে সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইল। ১৭৬৫ হইতে ১৮৩০ শক ৬৫ বৎসর। এই ৬৫ বৎসরকে স্মরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের উৎসব গণনা করিতে পারেন।

অতঃপর দেখিব মাঘোৎসব নাম কিরূপে প্রথিত হইল।

১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম হইলে ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা-গুলিন ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই সকল বক্তৃতা একত্র করিয়া এক পুস্তক প্রস্তুত করা হইয়াছে।

তাহার নাম "মাঘোৎসব।" সেই পুস্তকের সময় (১৭৮৭ শক) হইতে মাঘোৎসব নাম চলিতেছে। *

আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদাধিষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ এই ঊনাশীতি সাম্বৎসরিকের দিন বলিলেন—"আমরা পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল উৎসব করিতেছি।" পঞ্চাশ বৎসরের নিকটবর্ত্তী কোন্ ঘটনা হইতে কি প্রকারে এই কালের গণনা হইল, তাহা প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ইহার তিনটি কালবিভাগ ধরা যাইতে পারে। প্রথম দশ বৎসর অর্থাৎ ১৭৫০ বা ১৭৫১ শক হইতে ১৭৬০ শক পর্য্যন্ত রামমোহন ও তাহার অনুবর্ত্তীগণের কাল। তাহার পর ২০ বৎসর অর্থাৎ ১৭৬১ হইতে ১৭৮০ পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার কাল। তৎপরে প্রায় ২০ বৎসর অর্থাৎ ১৭৮১ শক হইতে ১৭৯৯ শক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসম্প্রদায় গঠনের কাল। ১৮০০ হইতে ১৮৩০ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর ব্রাহ্মসম্মিলনের কাল বলা যাইতে পারে। এই ৮০ বৎসরের প্রতি দশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের উপাসকদিগের ভাব ও গতির কিছু কিছু বিশিষ্টতা জানা যাইবে।

---

* আরো প্রচলিত নাম ১১ই মাঘের উৎসব।

প্রথম দশ বৎসরে রামমোহন রায় দ্বারা এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অনুবাদসহ প্রচার ও তাহার তাৎপর্য্যের অনুশীলন হয়; এবং মিশনরিদিগের সহিত খৃষ্টীয়ধর্ম্মের বিচার হয়। পরে সার্ব্বজনিক ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের পত্তন হয়।

রামমোহন রায়ের ধর্ম্মচর্চ্চায় এদেশে যে রব উঠিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক উদ্যমে সেই রবের পরিচয় পাওয়া যায়। নবযুবা দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্বরঞ্জিনী নামে এক সভা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রবীণতার সহিত সংযোগে ঐ সভার নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া তত্ত্ববোধিনী নাম প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল।

হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন তরলমতি ও সংশয়বাদী ছাত্রগণ এই সভার ধর্ম্মালোচনার প্রভাবে গীতোক্ত "স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ" লক্ষণান্বিত হইয়াছিলেন। গীতায় তত্ত্বতঃ শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেও "বদন্তি তত্ত্ববিদঃ" ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রারম্ভ হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনীসভারূঢ় দেবেন্দ্রনাথ সেই প্রকরণে "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি" বলিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামে

এক গ্রন্থের আকারে শাস্ত্রীয় ধর্ম্মোপদেশের সারোদ্ধার করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুকুমারমতি ছাত্রগণের চিত্তে তত্ত্ববোধের উপক্রম হয়, এই উদ্দেশে "তত্ত্ববোধিনী" নামে এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল। পরে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠদ্বারা সর্ব্বশ্রেণীর লোক তত্ত্বজ্ঞানালোক পাইতে লাগিলেন।

১৭৭১ শক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রচার হইলে তদবধি এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটি স্বতন্ত্র একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। নরনারীর হৃদয়ে কতদূর কি পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের অধিকার স্থাপন হইয়াছে, এবৎসর মাঘোৎসবের বক্তৃতায় তাহারই পরিচয় হয়। এ বক্তৃতার অধিকাংশ কথাই পূর্ব্ব-ইতিহাস-দ্যোতক। যাঁহারা অল্পবয়স্ক, আর যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত ভাল জানেন না, তাঁহারা উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতার মহদর্থ সর্ব্বাংশে পরিগ্রহ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। আমরা বর্ত্তমান সময়ের অনেক যুবা লোকের সহিত আলাপ করিয়া জানিতেছি, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাপর কথা শুনিতে আগ্রহান্বিত। একমেবাদ্বিতীয়ং এই ব্রাহ্মমন্ত্রের মধ্যে বিশ্বমঙ্গল যে একটি গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহার আভাস

মাত্রেই লোকের চিত্ত দ্রব হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে সেই তত্ত্বের স্ফুরণ দেখা যাইবে, এবং ইহাতে সার্ব্বজনিক সৌহার্দ্দ বর্দ্ধনের উপায় বা সন্ধান পাওয়া যাইবে, এমন আশা ঐ যুবজনগণের চিত্তে সহজে সঞ্জাত হয়। আর ইহাও বুঝিতেছি যে আলোচ্যমান প্রবন্ধে ঠাকুর মহাশয় যে মহাদিনের অভ্যুদয়ের আশা করিয়াছেন, সেই শুভ দিনের সমাগম পক্ষে ক্রমোন্নতিপ্রকরণে ঐ সকল যুবার জ্ঞান ও ধর্ম্মের পরিমার্জ্জনা আবশ্যক হইবে। অতএব বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে যে উষালোক প্রকাশ-মান, সেই প্রভাতী আলোক দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে বক্তা মহাশয়ের প্রত্যাশিত ভবিষ্যমঙ্গলের ভাব ও প্রভাব সুবিদিত হইবে।

জাতি ভিন্ন অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দের "ণ" লুপ্ত হইয়া ব্রাহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যথা—ব্রাহ্মমন্ত্র, ব্রাহ্মীতনু, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত ইত্যাদি। রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রহ্মের উপাসনা স্থান, এই অর্থে "ব্রাহ্মসমাজ" নামে উদিত হইয়াছিল।*

---

* আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামে ১৭৬৫ শকে প্রথম ১১ই মাঘের সাম্বৎসরিক সভার বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। তাহাতে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দৃষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬ সংখ্যা।

অতঃপর ব্রহ্মের উপাসকের এই অর্থে ব্রাহ্ম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা সম্বন্ধীয় ধর্ম্মের এই অর্থে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নাম করণ হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের পর ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইল।

১৭৫০ বা ১৭৫১ শক হইতে ১৭৮১ শক পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসর। এই ত্রিংশৎবর্ষ কালের প্রতি দশ বৎসরে ব্রাহ্ম-সমাজের এক একটি নিষ্ঠার বিশিষ্টতা প্রতীত হয়। রামমোহন রায়ের সময়াবধি প্রথম ১০ বৎসর শ্রুতি-নিষ্ঠা প্রবল ছিল। ১৭৬১ হইতে ১৭৭১ শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধ নিষ্ঠা। ১৭৭১ হইতে ১৭৮১ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্ঠা।

শ্রুতি-নিষ্ঠা কালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা ব্রহ্ম-সূত্র এবং তাহার শারীরক ভাষ্য, উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভগবৎগীতা, রামগীতা, যোগবাশিষ্ঠ, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা করিতেন। তখনকার ব্রহ্মসঙ্গীতে "মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, মূঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং" ইত্যাদি বাক্য শ্রুত হয়।

তত্ত্বাবোধ-নিষ্ঠার কালে, কোন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলা যায় না, ইহা প্রতিপন্ন হইল; এবং আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বৈজ্ঞা-নিক, ঐতিহাসিক, এবং শাস্ত্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বালোচনার অনুরাগ

বৰ্দ্ধিত হইল। তখনকার কর্ম্ম বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

ব্রাহ্মধর্ম্ম নিষ্ঠাকালে ঐ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ শাস্ত্রীয় বাক্যাবলী সংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত হইল। তাহাতে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসকগণ আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্মকে প্রাচীন ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া তৎপ্রতি গাঢ়তর শ্রদ্ধাবান হইলেন।

এই ত্রিংশৎ বর্ষে ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা তিন নামে পরিচিত হইতেছিলেন। প্রথম দশে বৈদান্তিক, দ্বিতীয় দশে ব্রহ্মজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী, তৃতীয় দশে ব্রাহ্ম।

এই ত্রিবিধ নিষ্ঠায় সুপণ্ডিত লোকেরা তত্ত্ববোধিনী-সভার আশ্রয়ে আপনাপন মতের পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইতেন। ১৭৬১ শক হইতে ১৭৮১ শক পর্য্যন্ত ২০ বৎসর এই সভার দ্বারা বঙ্গভাষার এবং সেই সঙ্গে বঙ্গীয় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সমুন্নতি হইয়াছিল। ১৭৮১ শকের ১১ই পৌষ ঐ সভা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। তাহাতে “ব্রাহ্ম” নামধেয় ব্যক্তিবর্গের প্রাধান্য লাভ হইল। অতঃপর ব্রাহ্মেরা আপনাদের মত ও বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যান করি-লেন, তাহাতে পূর্ব্বতন বৈদান্তিক বা ব্রহ্মজ্ঞানী নামধেয় বয়োবৃদ্ধ উপাসকগণের সর্ব্বতোভাবে ঐক্যমত জন্মিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণের মধ্যে ভেদবুদ্ধির উদয় হইল।

এই ভেদ বুদ্ধি বা ভিন্ন ভাব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। যাঁহারা বেদান্ত-নিষ্ঠায় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের সহিত উপনিষৎ, পঞ্চদশী, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের সম্যগ্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা দেশবিদেশে উদ্ভাবিত জ্ঞানালোকের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্বের গবেষণায় ব্রত হইলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে শাস্ত্রোদিত মহামূল্য সত্য-রত্ন দর্শন করিয়া সেইরূপ সত্যরত্নরাজির আশায় কেহ কেহ মহাভারতাদি বৃহৎ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম নামে পরিচিত, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা করিয়া আপনাদের পারিবারিক ক্রিয়া কলাপে পৌত্তলিকতা ত্যাগের পক্ষে আগ্রহান্বিত হইলেন।

১৭৮১ হইতে ১৭৯১ শক পর্য্যন্ত দশ বৎসর ব্রাহ্মসমা-জের অন্তরে ও বাহিরে দেশ-বিদেশ ব্যাপিয়া ঐ ব্রাহ্মসমা-জের প্রকৃতি ও প্রচার সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে ব্রাহ্মনামধেয় উপাসকেরা ভিন্ন ভিন্ন

সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে পৌত্তলিকতা ত্যাগ পূর্ব্বক পারিবারিক ক্রিয়াকলাপের যে সকল পদ্ধতি রচনা করিলেন, তাহাতে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; অথচ তাহার কোন পদ্ধতিতে সকলে এক-মত হইতে পারিলেন না। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা গেল যে ব্রহ্মোপাসনার মূল মতে সকলের ঐক্য থাকিবে। কিন্তু তাহার শাখাপ্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রসারিত হইতে পারিবে।

১৭৯১ হইতে ১৮০০।১৮০১ শক পর্য্যন্ত দশ বৎসর উপরি-উক্ত শাখাপ্রশাখা পূর্ণাবয়বে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। যাঁহারা ভাবিলেন হোমাদি পৌত্তলিকতা ক্রিয়া সমস্ত পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মের উপাসনা হইবে না, তাঁহারা পৌত্তলিকতার সংস্রব হেতু পূর্ব্বতন আত্মীয় কুটুম্বাদি হইতে বিচ্ছেদ স্বীকার করিলেন। এই পৌত্তলিকতাত্যাগী ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি অনুষ্ঠানকারী বা আনুষ্ঠানিক নামে এক স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইলেন, তাঁহারা রাজদ্বারে প্রার্থনা করিয়া আপনাদের সম্প্রদায়-বন্ধনের মূল বিবাহক্রিয়ার সিদ্ধির নিমিত্ত রাজকীয় আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।*

* ১৭৯০ শকের ২৫শে ভাদ্র, *September* 10, 1868 বিবাহ আইনের প্রস্তাবনা প্রচার হয়।

এই আইনপ্রার্থী ব্রাহ্মদিগের চেষ্টা ছিল যে ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ তন্নামধেয় ব্রাহ্মদিগের সমাজ একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হয়। কেবল তাঁহাদের উপাসনালয়ে বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের উপাসনার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণ লোকের অধিকার থাকে। এই উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের উপাসনা স্থানকে ব্রহ্মমন্দির নাম দেওয়া হইয়াছে। *

ঐ লক্ষ্য অন্তরে পোষণ পূর্ব্বক রামমোহন রায়ের স্থাপিত ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া কতকগুলি ব্রাহ্ম ১৭৮৮ শক কার্ত্তিক মাসে (১১ই নবেম্বর, ১৮৬৬) ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। আবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি উপাসক স্বতন্ত্র হইয়া ১৮০০ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে (১৫ই মে, ১৮৭৮) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করিলেন। ১৮০২ শকের (২১শে জুলাই, ১৮৮০) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড এবং পরে উহার বিধিব্যবস্থা প্রণীত হইল।

এই সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতার চতুর্দ্দিকে বঙ্গদেশের নানা স্থানে এবং উত্তর, পশ্চিম ও মুম্বই প্রদেশে

* ১৭৯১ শকের ৭ই ভাদ্র *August* 22, 1869 ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে প্রথম উপাসনা হয়।

ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশে যে সকল সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, সকলের এক নাম ছিল না। কোন স্থানে "জ্ঞান প্রকাশের সভা" কোন স্থানে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা" কোন স্থানে বা "প্রার্থনা সমাজ" ইত্যাদি বহু নামে ব্রাহ্মসমাজের অনুরূপ ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত সভা বা সমাজ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা ছিল, এই সকল সমাজ তাহার অন্তর্নিবিষ্ট বা শাখারূপে গণ্য হয়। ফলে তাহা হইল না। কলিকাতার প্রথম সমাজ "আদি ব্রাহ্ম-সমাজ" এবং উপরি উক্ত শেষ সমাজ "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নাম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিল। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মূলাধিষ্ঠিত ব্রাহ্মেরা ১৮০২ শকের মাঘোৎসবে (১৮৮১ সালের ২৬শে জানুয়ারি) আপনাদের মতকে ঈশ্বরের নববিধান বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহাতে আদি, নববিধান ও সাধারণ এই তিন নামে তিন স্বতন্ত্র প্রকৃতির ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর সকল ব্রহ্মোপাসকের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সকল মতভেদ, বিচ্ছেদ ও বিভাগ ২০ বৎসরের কর্ম্ম। প্রথমে ১৮৮১ শকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশে এই

ভেদ সাধনার মূল দৃষ্ট হয়। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলায় ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ সেবী; কেশবচন্দ্র বাইবেল-ভক্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঋষিদিগের ন্যায় ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন—কেশবচন্দ্র খৃষ্টশিষ্যদিগের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রচারে সমুদ্যত।

কয়েক বৎসর মাত্র এই দুই নিষ্ঠার কর্ম্ম একত্র চলিয়াছিল। পরে ভেদ পরিস্ফুট হইল। মতভেদে সাম্প্রদায়িকতার যে সকল দোষ উদ্ভব হয়, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সেই সকল দোষ জন্মিল। এই কালে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টীয় সমাজের সাম্প্রদায়িক বিবাদের লোমহর্ষণ সংবাদ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের গোচর হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় লোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা তাহাতে সবিশেষ অভিজ্ঞ। অতএব ব্রাহ্মেরা সাম্প্রদায়িকতার ঐ সকল কলঙ্ক হইতে আপনাদিগকে নির্ম্মুক্ত রাখিতে সর্ব্বদা সতর্ক রহিলেন।

ঈশ্বরের মনুষ্যাকারে অবতরণ বা তাঁহার অভ্রান্ত শাস্ত্র প্রেরণ এই দুই প্রধান মত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থাতেই খণ্ডিত হইয়াছে। তথাপি মনুষ্য বুদ্ধির ক্ষীণতা বশতঃ

জ্ঞানের তারতম্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মদিগের মতবিরোধপ্রবৃত্তি নিবারণ চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানোৎকর্ষের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। ১৭৯০ শকে আদিব্রাহ্মসমাজের ঊনচত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক সভায় শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর "জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য" বিষয়ে এক প্রবন্ধ রচনা করিয়া পুস্তকাকারে বিতরণ করেন। এই পুস্তকে তিনি এই মর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছেন যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানের ঔৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। নতুবা ঐ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুচিত কার্য্যকরী হয় না। তিনি একেশ্বরবাদী বেদান্তাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইহুদীয় ও খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদীদিগের বুদ্ধি ও বিচারের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে জ্ঞানের উন্নতি না হইয়া যেমন অবনতি হইল, অমনি উপধর্ম্ম-জালে প্রকৃত ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তেমনি আবার ধর্ম্মের বাণীকে অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানদর্পে বিমূঢ়চিত্ত লোকেরা অপরের উপর কত অত্যাচার করে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রবন্ধে গণেন্দ্রনাথ বকল-কৃত সভ্যতার ইতিহাস অবলম্বনে দেখাইয়াছেন যে প্রাচীন য়িহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেই আদিতে

বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন ; পরে তাঁহারা কতক উপ-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছেন। কালে কালে ধর্ম্মের এবম্বিধ গ্লানি উপস্থিত হয়, ইহা গীতার সুস্পষ্ট বাক্য। সম্প্রতি সর্ব্বদেশের উন্নতি ও অবনতির ইতিহাস সংগৃহীত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোক সমুজ্জ্বল হইতেছে। গীতা সেবী হিন্দুদিগের ন্যায় অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাও আপনাপন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সঞ্জাত গ্লানিরাশির মার্জ্জনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতকে ঐ বিচারে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া আসিতেছেন। তিনি কি ছিলেন? বৈদান্তিক, খৃষ্টান না ব্রাহ্ম ? এই বিচার তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক সভায় (১৭৭৬ শকে) প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বলিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রোদিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম। ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক সভায় গণেন্দ্রনাথের প্রবন্ধমুখে তাহাই পুনরায় বিশ্রুত হইল।

পূর্ব্বে এদেশের লোক পারস্যভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া কোরাণ ও হদিস প্রভৃতি গ্রন্থের শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। অতঃপর যিনি পারিবেন, তিনি রামমোহন রায়ের ন্যায়

সর্ব্বভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া পৃথিবীস্থ সর্ব্বশাস্ত্রের আলোচনা করিতে পারেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে উদারতা যথেষ্ট আছে। ভারতবর্ষীয় সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতে আদিব্রাহ্মসমাজের বর্ষীয়ান উপাসকেরা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠাংশ ধরিয়া তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ব্রাহ্ম বিবাহ ব্যবস্থা আছে, তাহাকেই আপনাদের বিবাহ বিধি বলিয়া তাঁহাদের অঙ্গীকার হইল।

১৭৯৪ শকে আদিব্রাহ্মসমাজের এক প্রাচীন প্রধান পুরুষ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারে হিন্দু ধর্ম্মকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিলেন। ইংলণ্ডের মহাপণ্ডিত মোক্ষ-মুলর রাজনারায়ণ বসু রচিত সেই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রবন্ধের মর্ম্ম সংবাদ পত্রে জানিতে পারিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের Science of Religion রচনা করিলেন।

খ্যাতনামা রাজনারায়ণ বসু প্রথম বয়সে মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি কেমন অনুরাগী ছিলেন, তাহা তাঁহার "আত্ম-চরিত" নামক পুস্তকে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার এবং তদ্বন্ধুবর্গের মনে যে হিন্দুভাব প্রবল ছিল, তাহা উত্তরোত্তর

দূরীভূত হইতেছিল। তিনি ইংরাজীতে বাইবেল ও কোরাণাদির সারসংগ্রহপূর্ব্বক তাহা "Hindu Theist's brotherly gifts to other theists" নামে প্রবন্ধ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা খৃষ্টানাদি অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সদ্ভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে হিন্দুধর্ম্মের যে পৌত্তলিক-পূজাদোষ, তাহা কিরূপে নিরস্ত হয়?

এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের যে চিরপোষিত মত, তাহাই পূর্ব্বোক্ত ৩৯শ সাম্বৎসরিক সভায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রবন্ধে ইউরোপের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যাঁহারা বেদান্তনিষ্ঠ, তাঁহারা চিরদিন সমদর্শী। ১৭৯৬ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি সভ্য আত্মপ্রত্যয় মতে সমদর্শী হইলেন। * ১৭৯৭ শকে এই মত ব্যক্ত হইল যে Idolatry is no sin।

ইহার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৬৮ শকে ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে পৌত্তলিকতা আচরণে কলঙ্কিত হইবেন কিনা

* ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ মাসে সমদর্শী পত্রিকার জন্ম হয়।

এ বিষয়ের বিচার হয়। তাহাতে Justicia এই উপনামক ব্যক্তির পত্রের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সমদর্শী পত্রিকার উক্ত বাক্যের অক্ষরে অক্ষরে মিল আছে। এই সময় দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্য্যসমাজ ইহাই অবধারণ করিলেন যে সর্ব্বপ্রাচীন ঋগ্বেদে ঈশ্বরের মূর্ত্তিপূজার উপদেশ নাই। হিন্দুসমাজের মধ্যে গীতার ব্যাখ্যাকার পণ্ডিতেরাও বলিতে লাগিলেন, দেবদেবীর কামনামূলক পূজা মোক্ষের কারণ নহে, উহা কনিষ্ঠ অধিকারীর কার্য্য।

আমরা এবৎসরের মাঘোৎসবের বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের এতগুলি কথা বলিলাম। ইহা সেই ব্রাহ্ম ইতিহাসের ষষ্টি বৎসরের বিবরণ। ১৮০০ শক হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ত্রিশ বৎসরকে ব্রাহ্ম সম্মিলনের কাল গণনা করা যায়। সেই ব্রাহ্ম সম্মিলনে কোন্ লক্ষ্য সাধিত হইবে, তাহাই এই আলোচ্যমান প্রবন্ধের দ্বারা বিদিত হইতে পারিবে। এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে ব্রাহ্মদিগের ভাব ও গতি বুঝিতে পারা যাইবে। তাহাদের সম্প্রদায় বিষয়ে আরো কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তদ্বারা সেই সম্প্রদায় বন্ধনের লক্ষণ বিদিত হইবে।

বেদমূলক হিন্দু শাস্ত্রসকলকে লক্ষ্য করিয়াই "অনন্ত শাস্ত্রং" বলা হইয়াছে। তাহার সহিত পৃথিবীর চারি মহা-দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলকে একত্র করিলে সেই শাস্ত্র রাশির সংখ্যা বা পরিমাণ কোন্ শব্দে ব্যক্ত করা যাইবে— সে শব্দ নাই। অতএব পুরাণকারের এই উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়—"যৎ সারভূতং তদুপাসনীয়ং" যাহা সারভূত তাহাই সেবা করিবে। এই মতে রামমোহন রায় ব্রহ্ম-সূত্র গ্রন্থের সার উদ্ধার পূর্ব্বক "বেদান্ত সার" প্রচার করেন। সেই শিক্ষানুসারে এতদ্দেশের প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নামে একগ্রন্থ প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেদান্তসারে রামমোহন রায় দেখাইয়াছেন যে বর্ণাশ্রমী ব্যক্তির যেমন ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার, অপর লোকেরও তেমনি অধিকার আছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (প্রথম কল্পের শেষে ১৭৬৫ শকের চৈত্র) এই সিদ্ধান্ত ধরা হইয়াছে। শ্রুতির সারার্থ লইয়া মনুসংহিতায় এই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে যে, "আত্ম জ্ঞানং পরং স্মৃতং" আত্মজ্ঞান সর্ব্ববিদ্যার সার, এই সকল বিচার সর্ব্বসাধারণ লোককে ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত করা ব্রাহ্মসমাজের প্রধান এবং চিরন্তন লক্ষ্য। ব্রাহ্মসমাজের

শরীরে এই উনাশীতিবর্ষ বয়সে কতই পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু আদিম গঠনের কিছু অন্যথা হয় নাই।

এপর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মসমাজের যে ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলাম, তাহাতে প্রতীতি হইবে যে ব্রাহ্মসমাজের এই বর্ণাশ্রমাচারনিরপেক্ষ উপাসকেরা ১৭৮১ শক হইতে ১৮০০ শক পর্য্যন্ত ২০ বৎসরে জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞানীর ন্যায় বলিতে পারেন আমরা "নব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ"। ব্রহ্মৈকনিষ্ঠায় প্রাচীন বেদসন্ন্যাসীদিগের ন্যায় ভারতের আধুনিক বহু সম্প্রদায় অস্মদ্দেশীয় বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ন্যায় জাতিভেদ ত্যাগ করিয়া এক এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই ধারায় সম্প্রতি ব্রাহ্ম নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল বলিতে হইবে।*

আত্ম-প্রত্যয় মতে এক মাত্র নিত্য সত্য পরমাত্মার ধ্যান চিন্তা ও প্রার্থনাদি কর্ম্ম হইবে। এই উপাসনায় শাস্ত্রের বা কোন ব্যক্তির আধিপত্য থাকিবে না, ব্রাহ্ম-সমাজের এই মূল মন্ত্র। এই তত্ত্বের সঙ্গে কোন কুসংস্কার বা উপধর্ম্ম সঞ্জাত না হয়, এই উদ্দেশে বিবিধ যুক্তি দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের বিচার করিতে হয়। সেই বিচারে মতভেদ

এবং মতভেদে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু বা বৈদিক শাস্ত্রের প্রভাব অধিক দেখিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ তথায় বেদ বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের পাঠ আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। তেমনি আবার ধর্ম্মবক্তা, আচার্য্য বা উপদেশক প্রভৃতি পদাধিষ্ঠিত হইয়া কেহ ব্রাহ্ম-সমাজে আধিপত্য বিস্তার না করেন, ইহার সবিশেষ বিধানে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮০০ শকের প্রথমে উপরি-উক্ত উদ্দেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মেরা ইহাও প্রতীতি করিলেন যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অসদ্ভাব সর্ব্বদা পরি-হরণীয়। এই প্রত্যয় প্রবল হইলে সদ্ভাব বর্দ্ধনের নিমিত্ত ঐ বৎসর মাঘোৎসবের কয়েক দিন পরে, রাম মোহন-রায়ের স্মরণ উপলক্ষ করিয়া ব্রাহ্মেরা এক সভায় সম্মিলিত হইলেন।

এই বৎসরাবধি ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি পদের অনন্যগামী কোন বিশিষ্ট মর্য্যাদা থাকিল না। অধিকন্তু যাঁহারা ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ না করিবেন, এমন লোক-দিগেরও ব্রাহ্মসমাজে কোন কোন সম্পর্ক বা অধিকার থাকিল।

ইহার পূর্ব্বে একেশ্বরবাদী আর্য্য-সমাজের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার বিষয় বলিয়াছি। ১৮০০ অবধি ১৮১০ শক পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ব্রাহ্মসমাজত্রয়ে স্বাধীন-মতে যে সকল কার্য্য চলিতে লাগিল, তাহাতে আর্য্য-সমাজের কোন কোন ব্যক্তি এবং তন্ত্রসেবী রামকৃষ্ণ পরমহংস কিয়-দংশে ব্রাহ্মদিগের উপদেষ্টার বরণ পাইলেন। উক্ত পরম-হংসদেবের গভীরার্থ অথচ সহজ দৃষ্টান্তকথায় অনেকের মন পরমার্থে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার প্রভাব ও উপদেশ পাইয়া নব-বিধানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন পৌরাণিক অলঙ্কারযুক্ত কথায় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। ইহার পর আর দশবৎসর মধ্যে উক্ত পরমহংসের সন্ন্যাসী শিষ্য বিবেকানন্দ আমেরিকা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া গীতোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থার বৈদান্তিক আলোচনা প্রবল হইয়া উঠে।

এ সময়ে এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও গীতার তাৎ-পর্য্যার্থ এবং দেবদেবীপূজার কল্পনাবৃত সদর্থ উন্নয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওদিকে ইংলণ্ড ও জর্ম্মনিদেশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা বৈদিক শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যানে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ লোকদিগের চিত্তে, হিন্দুধর্ম্মের ঔৎ-

কর্ষ কি, তাহা সুবিদিত হইল। ভারতে থাকিয়া থিও-সফিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান পুরুষেরা হিন্দু এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনায় জ্ঞানালোকের বিস্তার করিলেন। তাহাতে এদেশীয় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সুশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান মার্জ্জিত ও উন্নত হইল।

এতাবৎ প্রকরণে দেশ বিদেশে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মো-পাসনা প্রচার হইল এবং সাধারণ লোকের চিত্তে আধ্যা-ত্মিক উন্নতির আবশ্যকতা অনুভূত হইল। ব্রাহ্ম-জীবনের সাধনা কি, সে চিন্তায় ব্রাহ্মেরা অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা নিরত রহিলেন।

নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা অধিকতর ধ্যান-মগ্ন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসকেরা বিধি ব্যবস্থা পুর্ব্বক আপনাদের মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তৎপর হই-লেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ন্ত্রিত এক ব্রাহ্মসম্মিলনী সভায় সাধুচরিত্র উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন—“সংসারকে ধর্ম্মময় করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব; তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজকে যেন সংসারময় করা না হয়, ইহার নিমিত্ত সযত্ন হইতে হইবে।”

ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ইতিহাস পুনরাগত, এমন

বোধ হইবে। পূর্ব্বের অর্দ্ধশতাব্দীতে যে প্রকরণে ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি হইয়াছে, পরার্দ্ধে সেই প্রকরণে ইহার কার্য্য চলিলে পূর্ণ শতাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সম্যক পরিপুষ্টি ও সার্ব্বাঙ্গিক সমুন্নতি সম্পাদিত হইতে পারিবে।

রামমোহন রায়ের কালে অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের প্রাথমিক দশবৎসরে এক ঈশ্বর-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রচার ও তাহার বিচার চলিয়াছিল। শেষের এই ত্রিশ বৎসরের প্রথম দশ বর্ষ সেইরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যানে অতিবাহিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দশবার্ষিকী চেষ্টায় যুবক ও বালকদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার নিমিত্ত নানা স্থানে আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তৃতীয় দশবার্ষিকী সাধনায় ঐ আশ্রম বিদ্যা-লয় প্রকরণে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এই ধারায় ভবিষ্যৎ দুইশত বৎসরের উন্নতির অনুমান করা যাইতে পারে। আদি ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত পৃথিবীর আদি ব্রাহ্মসমাজ; সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গল ইহার চিন্তনীয়। এই বৎসর ইংলণ্ডেও ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছিল। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মমণ্ডলীর আচার্য্য শ্রীযুক্ত ভয়সি সাহেব সেই সাম্বৎসরিক সভায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যে দিন এই উনাশীতি সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজের নামে পবিত্র ব্রহ্মানুকীর্ত্তন পূর্ব্ব-পশ্চিম দিগ্‌ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল, সেই শুভ দিনে আদিব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের মুখে পৃথিবীর ভূত, ভবিষ্যৎ মঙ্গল সংবাদ বিশ্রুত হওয়াই সঙ্গত।

নিশ্চেষ্ট ভারতে ধর্ম্মের ফলাফল বিষয়ে কাহারো মনে কোন সংশয় সমুত্থিত হয় নাই। ইউরোপের কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মের শুভজনকতা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলেন যে, যখন ধর্ম্মযাজকেরা বিবাদের দাবানল জ্বালিয়া থাকেন এবং বীরপুরুষদিগের সমরপ্রবৃত্তি খর্ব্ব হইতেছে না, তখন ধর্ম্মের দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল কিসে গণনা হইবে? বস্তুত যদি ধর্ম্ম হইতে সার্ব্বজনিক শুভোৎপত্তি না হয়, তবে উহাকে প্রকৃতার্থে শ্রেয়স্কর বলা যাইবে না। ভারতে ধর্ম্মের এই লক্ষণ বহুশ্রুত :—

"ধর্ম্মঃ শ্রেয়ঃ সমুদ্দিষ্টঃ শ্রেয়োঽভ্যুদয়লক্ষণম্", যাহাতে শ্রেয় হয় তাহাই ধর্ম্ম ; যাহাতে অভ্যুদয় লক্ষণ দৃশ্যমান হয়, তাহাকেই শ্রেয় বলা যায়।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্যে এই অভ্যুদয় লক্ষণান্বিত শ্রেয় সাধিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই লক্ষ্য, সেই সাধনা। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গণেন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের

এইরূপ প্রকৃতি নিরূপণ করিয়াছিলেন। তিনি এই আভাস দিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারাই সর্ব্ব বিরোধ তিরোহিত হইয়া পৃথিবীতে অক্ষুন্ন শান্তি বিরাজ করিবে। সেই আভাস আজিকার আলোচ্যমান প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

কালক্রমে ভারতে পৃথিবীস্থ সকল প্রচলিত ধর্ম্ম একীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই ভারতক্ষেত্রে—এই অধন্য বাঙ্গলাদেশে ধর্ম্মসমন্বয় ও জাতিসমন্বয়ের সম্ভাবনা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—বহু প্রাচীনকাল হইতে এই মহতী সভার আসন বিস্তার হইতেছে। ১৮০০ শকে ব্রাহ্মদিগের প্রথম সম্মিলনে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধজনিত মনোমালিন্য দূর হইবে। ত্রিশবৎসর পরে আজি রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—স্থানীয় ধর্ম্মের ও সাময়িক লোকাচারের সকল বাধা-গণ্ডি হইতে আজি আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

নবযুগের সিংহদ্বার খুলিয়া সমস্ত মনুষ্যমণ্ডলীকে এই সভায় আহ্বান করা যাইতেছে। একোমেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্রে বিশ্ব-মানবের অমোঘ শক্তি-সমাবেশের চেষ্টা হইতেছে। এক এক দেশে ইস্রেল ও মক্কাবাসীগণকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলা হইয়াছে—আজি বিশ্ববাসীকে অমৃতের পুত্র

বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক সেই সমস্ত মহামন্ত্র স্মরণ করা হইল।

১৮০০ শকে যে প্রাঙ্গণে প্রথম ব্রাহ্মসন্মিলন হয়, আজি রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাঙ্গণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হই৷ বিশ্বের মহা প্রাঙ্গণ। এই দিনের প্রভাতে আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আঁচার্য্য রবীন্দ্রনাথ মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অধীনতার রহস্য ভেদ করিয়া কবিত্বময় সহজ ভাষায় উপনিষদিক আত্মক্রীড়া আত্মরতি বুঝাইয়াছিলেন। সায়ং কালে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের যে সকল ইতিহাসের উপর ইঙ্গিত আছে, তাহা পাঠকগণের গোচর করিলাম। প্রবন্ধের আশা ভবিষ্য মঙ্গল। উহাতে যে মহাদিনের অভ্যুদয়ের সূচনা হইয়াছে, তাহা কেমন সঙ্গত, তাহাই আমরা পূর্ব্বের কয়েক পৃষ্ঠায় বিবৃত করিলাম।

রবীন্দ্রনাথ এবৎসর মাঘোৎসবের একটি নূতন প্রকৃতি নিরূপণ করিলেন। ইহা ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক মিলন নয়। আরাম বিশ্রাম বা পরস্পরের আনন্দ ছাড়িয়া অনেক ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রসঙ্গ হইল।

প্রাচীন ভারতের ঋষিদিগের নামে কথার উদ্‌ঘাত হইল।

চারিদিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ এক ঈশ্বরের পূজার্থ এই বঙ্গ-দেশে মিলিত হইতেছেন। অতএব এই দীনহীন বঙ্গদেশকে ধন্যবাদার্হ বিবেচনা করা হইয়াছে।

এই ধর্ম্মক্ষেত্রে এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মের যথোপযুক্ত সম্মাননা আবশ্যক। অতএব বক্তা বলিয়াছি-লেন—পূর্ব্ব পশ্চিম এক হইল, ঋষিদিগের সহিত বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ সকলে এক বিশ্বমানব গঠনের উপাদানভূত হই-লেন। এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্য ভার-তের অনেক কথা শুনা গিয়াছে। এক্ষণে আর বাক্যব্যয়ের অপেক্ষা নাই; কর্ম্মসূত্র ধরিয়া চলিত হইবে। কর্ম্মের নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকটী মীমাংসিত মত ও নীতি প্রভা প্রদর্শন করিতেছি।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মে য়িহুদী জাতির ঈশ্বর কেবল তাহাদের নয়, পরন্তু সর্ব্বজাতির পূজনীয় ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। ঈশ্বরের অন্য খোয়াড়ে যে সকল মেষ আছে, অর্থাৎ য়িহুদী ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে যে সকল ভক্ত লোক আছেন, তাঁহারাও ঈশার নিকট আনীত হইবেন এবং একসম্প্রদায়-ভুক্ত হইবেন।

যোহন ১০, ১৬

কোরাণে দেখা যায়, নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মক্রিয়াকে ঈশ্বর আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের লোক মহম্মদের সহিত বিবাদ করিবেনা; প্রত্যুত মহম্মদ তাহাদিগকে এক ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিবেন, ইহাই ঐশ্বরিক আদেশ। সুরা হজ, ৬৭।

সর্ব্বজাতির লোক আপনাপন ধর্ম্মপথে আসিয়া ঈশ্বরের উদার দানের গুণে বৃষ্টি ও শস্য, সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেছে, ইহা খৃষ্টশিষ্যদিগের উক্তি।

(প্রেরিতদিগের ক্রিয়া ১৪ অধ্যায় ১৬, ১৭ পদ।)

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এতাদৃশ উক্তি গীতাবাক্যের সমান।

যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৯, ২৩।

তবে নানা দেবতার উপাসনার দোষ কি? ইহা বিচার করা আবশ্যক। দোষ পাপাচারে। বহু দেবোপাসক-দিগের এই দোষাখ্যান গীতা গ্রন্থের ষোড়শাধ্যায়ে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

দম্ভমান মদান্বিত লোকেরা দুষ্পূর কামনার বশে নানা দেবতার ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রাত্মক ভজনা করে। তাহারা মোহ-

গ্রস্ত এবং অশুচিব্রত। আসুর স্বভাবান্বিত হইয়া তাহারা আপনার ও পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক সাধু পৌল, গ্রীস দেশের বহু দেবমূর্ত্তির পূজার সংশ্রব ত্যাগ করিবার পক্ষে এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে উহাতে দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা লোভাসক্ত ও বিচারবিমূঢ় হইয়া পড়িবে। ১ করিন্থীয়, ৮ অধ্যায়।

সর্ব্বদা লোভাদি দোষ দূরপরিহার্য্য। যাহারা পাপাসক্ত তাহারা আসুরী যোনিতে নিক্ষিপ্ত হয়, গীতার এই মত। খৃষ্টশিষ্য পৌল রোমীয় মণ্ডলীর পাপদমন পক্ষে তাহাই বলিয়াছেন। রোম ১ অধ্যায়, ২৪-৩২।

রামমোহন রায় সামাজিক সুখ শান্তির পক্ষে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে মহদুপায় জ্ঞান করিতেন। এই ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই যে আপনাকে ইন্দ্রিয়সেবার পক্ষে মৃত এবং ধর্ম্মসেবার পক্ষে উজ্জীবিত জ্ঞান করিবে। খৃষ্ট মাংসময় শরীরে মৃত হইয়াছিলেন; আত্মাময় হইয়া উত্থিত হইয়াছেন। ইহাই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ; ইহাই খৃষ্টীয় দ্বিজত্ব।

খৃষ্টীয় সমাজে বৈষয়িক বিবাদ দর্শন করিয়া তৎপ্রশমন এবং সদ্ভাব সম্বর্দ্ধন উদ্দেশে সাধু পৌল যে সকল উপদেশ

দিয়াছেন, তাহা কার্য্যে আনিতে পারিলে জনসমাজে অক্ষুণ্ণ শান্তি বিরাজ করিবে। কতকগুলি উপদেশ অতি মহৎ; তাহার আলাপেও পুণ্যোদয় হয়। তিনি বলিয়াছেন—"ভ্রাতৃবর্গের কৃত অন্যায় সহ্য করিতে পারিবে না কেন? "ভ্রাতৃপ্রেম উপছাইয়া পড়ুক"; "শত্রুর উপকার কর"; "চৌরকে এমন শিক্ষা দেও, যেন সে স্বকীয় পরিশ্রমোপার্জ্জিত ধনে দীন দুঃখীর উপকার করিতে উদ্যত হয়;" "দুর্ব্বলকে বল দেও"; "প্রেমে সহিষ্ণু হও"; "কুক্রিয়ার অভ্যাস পর্য্যন্ত পরিহার কর"; "আত্মজ্যোতি নির্ব্বাণ হইতে দিওনা"; "নিরন্তর প্রার্থনা করিয়া আপনাকে ধর্ম্মপথে স্থির রাখ"।

এই সমস্ত ধর্ম্ম জ্যোতি ও নীতি প্রভা ধারণ করিতে পারেন, ব্রাহ্মসমাজের এই গৌরব। তৎপক্ষে যে সকল বাধাবিঘ্ন—সেই বাধাবিঘ্ন বা পার্থক্য, ভাগ, বিচ্ছেদ সমস্ত ত্যাগ পূর্ব্বক সদ্ভাবে ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলেই বঙ্গদেশের দীনতা অপগত হইয়া তাহা মহোন্নতিতে অগ্রসর হইবে।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের ভজনগীতি শ্রবণে হিন্দু সাধারণের পরমানন্দের উদয় হয়। ব্রাহ্মদিগের গীতে যখন এই প্রতিজ্ঞা শুনিবেন—

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ—
জয় জয় সত্যের জয়।

তখন কে সেই প্রতিজ্ঞায় যোগ না দিবেন। যখন ব্রাহ্মেরা গাহিবেন—

যদি দুঃখে দহিতে হয়
যদি দৈন্য বহিতে হয়
নাহি ভয় নাহি ভয়।

তখন হিন্দুরা কি উৎসাহান্বিত হইয়া মাভৈঃ শব্দ করিবেন না?

ব্রাহ্মসমাজে যে যে অংশে অপর লোকদিগের সহিত ভিন্ন ভাব বা পার্থক্য বলবৎ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা যদি নিরস্ত হইল এবং বিশ্বমানবের মহোন্নতিকে বরণ করা হইল, তবে প্রথমে ভারতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উচ্চতর সাধকদিগকে এক পরমাত্ম-জ্ঞানানন্দের সহভাগী গণ্য করা যায়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভে অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেই ব্যাখ্যা আরো বিশদ করিয়া দেওয়া

হইয়াছে। এই সময়কার ব্রাহ্মসমাজের গীতে নিত্যানিত্য বিবেকাদি তত্ত্বকথা হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রচার হইত। তৎপূর্ব্বে হিন্দুস্থানের নানকপন্থী, কবীরপন্থী, রামায়ত সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের ভজন গীতিতে বেদান্ত-শাস্ত্রের গভীর আত্মতত্ত্ব-কথা মনোজ্ঞরূপে ব্যক্ত করিয়া লোকের মোহান্ধচিত্তে জ্ঞানালোকের দীপ্তি দেখাইতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের গীতে সেই সকল ব্রহ্মতত্ত্ব উত্তরোত্তর অধিক হৃদয়স্পর্শী হইতেছে না কি? অল্পদিনের রচিত একটি গীত উদাহরণ দিতেছি।

রাগিণী কাফি—তাল সুরফাঁক্‌তা।

শূন্য হাতে ফিরিহে নাথ পথে পথে ফিরিহে দ্বারে
চির-ভিখারী হৃদি মম নিশি-দিন চাহে কারে।
চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে,
যাহা পাই, তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।
সকল যাত্রী চলি গেল, বহিগেল সববেলা,
আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা।
কত পথ আছে বাকী, যাব চলি ভিক্ষা রাখি
কোথা জ্বলে গৃহ-প্রদীপ কোন্ সিন্ধু পারে!

আত্মৈবোপাসিতব্যং ইত্যাদি ঔপনিষদিক বাক্যে যে

একনিষ্ঠ হইবার উপদেশ আছে, নান্যেন পালনীয়ং ইত্যাদি বাক্য তাহারই সহযোগী। গীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যে সেই এক ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ আছে। এই সকল শাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করিয়া কেহই আজি ব্রাহ্মদিগের ঐ "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাণীকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক করা, মধ্যভূমি এই ভারতবর্ষেই সঙ্গত। একমেবাদ্বিতীয়ং এবং লা ইলা ইল্ ইল্লা এই স্থলে সম্ভজনীয় হয়েন। আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ এবং Bless them that curse you এই দেশে এক বাক্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।

বিবিধ প্রবন্ধ।

উৎসব। *

"উৎসব মনুষ্যের এক উচ্চতর অধিকার। ক্ষুদ্রতায় তাহার স্ফূর্ত্তি নাই। সেই অনাদি অনন্ত অবিনাশী পুরুষের মহান্ ভাব তাহার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কেবল সংখ্যাগণনায়—যোগবিয়োগে তাহার সার্থকতা নাই; পরস্পরের মধ্যে লাভালাভের তুলনা করিয়া গৌরবানুভব করাতে তাহার উৎকর্ষ নাই, স্বার্থ সাধনের সুরঙ্গ, মেলার বিস্তারে তাহার মহত্ব নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি ও নিয়তি এক স্বতন্ত্রপ্রকার। তাহার আত্মা এরূপ পদার্থে সংরচিত যে, যাহা নিতান্ত পার্থিব ও ক্ষণিক, তাহা লইয়া সে কখনই সুখী হইতে পারে না। এই জন্য ঈশ্বর এই মর্ত্ত্য লোকেই কতকগুলি স্বর্গের উপাদান রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই সে এখানে আনন্দের সহিত জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সে সকল উপাদান—ঔদার্য্য, সরলতা ও স্বাধীনতা—ভক্তি, প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য—শান্তি, স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ।

---

* ১৭৯১ শকের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মাঘোৎসবে ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ লেখককর্ত্তৃক পঠিত এবং উক্ত শকের ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

মনুষ্য যে কোন অবস্থায় অবস্থাপিত হউক, এইসকল মহোন্নত ভাব সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সজীবতা প্রদান করে। সংসার মনুষ্যকে কত অগণ্য অমূল্য সুখসম্পত্তি প্রদান করে, তথাপি তাহাকে অন্যবিধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় কেন? বিদ্যা বুদ্ধি, যশঃ কীর্ত্তি, প্রভুত্ব শূরত্ব প্রভৃতি গুণনিচয় এত প্রকারে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সংসাধন করে, কিন্তু যেখানে প্রীতির সহিত বা ভক্তির সহিত সম্বন্ধ, সেখানে ঐ উন্নত জ্ঞান-বিশিষ্ট খ্যাত্যাপন্ন লোক অথবা মহাপ্রতাপশালী শূর সকল কি কারণে অবনত হইয়া প্রসাদ প্রার্থনা করেন? পৃথিবীতে মনুষ্যের সুখ ভোগের নিমিত্ত বিবিধ রস-পুরিত দ্রব্য সামগ্রীর অভাব নাই, কিন্তু তানলয় যুক্ত সুস্বর সঙ্গীত-মাধুর্য্যে অথবা বিষয়াতীত উন্নত ভাব সমন্বিত রসাত্মক বাক্যে কেন তাহার মন এরূপ প্রমোদিত হয়? যে সকল বস্তু মনুষ্যের আয়াসোপার্জ্জিত এবং যাহাতে তাহার বুদ্ধি-শক্তি বা কার্য্য-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহাতেই মনুষ্যের প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষিত হওয়া সুসঙ্গত; কিন্তু যে সকল বস্তু মনুষ্যের অঙ্গুলি-রচিত নয়—যাহা মনুষ্য সম্বন্ধে এক প্রকার দেব-প্রসাদ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই মনুষ্যের কি জন্য এতদূর আনন্দ বর্দ্ধন করে?

তাহার কারণ এই যে, লাভালাভ—যশঃ-কীর্ত্তির সহিত আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ, আর প্রীতি ভক্তি ও সহৃদয় ভাবের সহিত আমাদের স্বর্গীয় সম্বন্ধ। পার্থিব সম্বন্ধ দুর্ব্বল ও নশ্বর, স্বর্গীয় সম্বন্ধ প্রবল ও অনন্ত-কাল স্থায়ী। এই জন্যই ঐ সকল স্বর্গীয় ভাব সকল বিষয় হইতে মনুষ্যকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে।

যেখানে প্রীতি সৌহার্দ্দ্য ও স্বাধীনতা সেই খানেই উৎসব। উৎসব-প্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিগত। উৎসবে দেবভাব প্রকাশ পায়। উৎসবালয় দেবলোকের অনুকৃতি। উৎসবালয়ে দ্বেষ হিংসার গন্ধ নাই, লাভালাভের সংস্রব নাই, হৃদয়গ্রন্থির চিহ্ন নাই। তথায় ক্ষুদ্রতা দৃষ্ট হয় না,—স্বার্থপরতা তাহার দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। ঔদার্য্য সেখানকার মুখ্য শোভা, স্বচ্ছন্দতা তথাকার প্রধান ভোগ্য, সৌহার্দ্দ্য সেখানকার প্রকৃষ্ট দর্শন এবং শান্তি সেখানকার প্রধান বিলাস। সেখানে প্রধান ও নিকৃষ্টের ভাব—মান অপমানের ভাব কিছুই নাই; সেখানে দাতা ভোক্তা বা বাধ্য বাধক এরূপ সম্বন্ধ নাই; কোন বিষয়ে জিগীষার সংস্পর্শও নাই। উৎসবালয়ে কেবল প্রেমের ব্যাপার আনন্দের ব্যাপার চারিদ্দিকে লক্ষিত হয়।

এরূপ স্থান দেবলোকের অনুকৃতি—এ স্থানের ভাবসকল স্বর্গীয় ভাব, তাহার আর সন্দেহ কি ?

কিন্তু হায় ! পৃথিবীর ধূলি কোন্ বস্তুকে মলিন করিয়া না তুলে ? পর্ব্বতনিঃসৃতা বিমলসলিলা স্রোতস্বতী যখন জনসমাজে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার সেরূপ নির্ম্মলতা কোথায় থাকে ? আমি এতক্ষণ যে সকল স্বর্গীয় উপাদানের কথা বলিলাম, সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহার কি পর্য্যন্ত না বিকৃতাবস্থা দেখিতে পাই ? হায় ! কোথায় সেই জলন্ত প্রীতি, যাহার তেজস্বিতা দেখিয়া বোধ হয় যে অনন্তকালেও ইহা কখন নির্ব্বাণ পাইবে না ? কোথায় সেই অটল নিষ্ঠা ও অচল উদারতা, যাহার মহত্ব ও সারবত্তা দর্শন করিলে অনুভব হয় যে, ইহা আকাশ অপেক্ষাও প্রশস্ত এবং পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর ? কোথায় সেই অমূল্য স্বাধীনতা, যে আমাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, সেই অকৃত অমৃত মঙ্গলময় পুরুষের অভয় পদে নিরন্তর সংযোজিত করিয়া রাখে ? কোথায় সেই মহোচ্চ আশা, যাহার চরিতার্থতার নিমিত্ত অনন্ত লোকে অনন্ত প্রকার সুখসামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে ? আর কোথায় বা সেই পবিত্র উৎসব, যাহার গীতশব্দে দেবতারাও

উল্লসিত হইয়া করতালি প্রদান করেন? হায়! পৃথিবীর কি বিপর্য্যয় ভাব! এখানে এমন সকল আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, যাহার অন্তরে কেবল বিষাদেরই কারণ সকল লক্ষিত হইতে থাকে। এখানে এমন সকল উৎসব-কোলাহল শ্রুতিগোচর হয়, নিদারুণ শোকই যাহার পরিণাম। প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য মনুষ্যের জীবন তুল্য, কিন্তু এখানে তাহা কত মারাত্মক রূপ ধারণ করে। স্বাধীনতা মনুষ্যের সকল সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ, কিন্তু সেই অমৃতপ্রসবিনী এখানে কত রাশি রাশি বিষময় ফল উৎপাদন করে। হায়! পৃথিবীর এ কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় আর কোথায় গিয়া উৎসবসুখ সম্ভোগ করিব, তাহার স্থান তো দেখিতে পাই না।

উৎসব স্বর্গরাজ্যেরই প্রধান দর্শন। উৎসবের মধ্যে যে সকল সুনির্ম্মল ভাব ব্যক্ত হইতেছে, সেই ঊর্দ্ধতন লোকেই সেই সকল ভাব সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হয়। সেখানে দুঃখ ক্লেশ শোক তাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে কোন প্রকার মলিনতা স্থান প্রাপ্ত হয় না। সুগঠিত বীণা যন্ত্রের তন্ত্রী সকল যেমন পরস্পরের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্যে সুমধুর স্বর-সুধা বর্ষণ করে, সেইরূপ দেব-

তাদিগের সংযত প্রবৃত্তি সকল সর্ব্বসামঞ্জস্যে সেই দেবাদি-দেবের গুণগান ও সেবা করিয়া চারি দিকে শোভা ও মাধুর্য্য বিস্তার করিতে থাকে। সেখানকার প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্য উদারাশয়তায় পরিপূরিত। সেখানকার উৎসব-মন্দির পবিত্রতার আলোকে আলোকিত। প্রাণ-মনঃস্নিগ্ধ-কারী শান্তিসমীরণ সেইখানেই নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে; আত্মার তৃপ্তিকর আনন্দের প্রস্রবণ সকল সেই খানেই নিরন্তর প্রসৃত হইতেছে। ঈশ্বরই দেবতাদিগের সকল উৎসবের অধিদেবতা; তিনিই তাঁহাদের উপজীব্য। তাঁহা-দিগের উৎসব-সঙ্গীতে কেবল সেই বিশ্বাধিপের অতুল করুণা কীর্ত্তিত হয় এবং সমস্ত জগতের কল্যাণ-বার্ত্তা ঘোষিত হয়।

কিন্তু স্বর্গেই কি কেবল সেই আনন্দের উৎস বদ্ধ রহিয়াছে? মনুষ্য যত দিন পরলোকে গমন না করিবে, তত দিন কি সে সেই অমৃতের স্বাদগ্রহ করিতে পাইবে না? না, এরূপ নহে। সেই করুণাময় পিতা এই মর্ত্ত্য লোকেই সেই দেব-ভোগ্য সুধার আধার প্রস্তুত রাখি-য়াছেন। যে ব্যক্তি তাহার অনুসন্ধান করে, সেই তাহার স্বাদগ্রহ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই স্বর্গীয় সুধার আধার-স্বরূপ।

যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঈশ্বরের হস্তে আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে গ্রহণ করিয়া মধুরালিঙ্গন প্রদান করেন। সেই প্রেমের আকর সৌন্দর্য্যের সাগর করুণা-নিধান সকল উৎসবের নিদান। যে উৎসব তাঁহার দ্বারে সম্ভোগ করা যায়, তাহার আর কোন কালে ক্ষয় নাই। তাহাতে কিছুমাত্র মালিন্য নাই; তাহা চিরদিন নূতন। মানব-আত্মার উন্নত প্রকৃতির ইহাই যথার্থ উৎসব। ইহাতেই তাহার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ হয়।

হে মানব! তুমি তোমার আত্মার গতি ও পৃথিবীর অবস্থা পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলেই সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবে। সত্য বটে, তোমার প্রীতিবৃত্তি ও উৎসব-বাসনা নিতান্তই প্রবল; কিন্তু পৃথিবীতে তোমার সকল অভিলাষ কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? তুমি যদি নীচপথগামী হও—যদি নিকৃষ্ট বিষয় লইয়া উৎসব সম্ভোগ কর, তাহা হইলে তোমাকে শীঘ্রই পতিত হইতে হইবে; কারণ, সে সকল উৎসব তোমার দেবসংসর্গী আত্মার জীবন-শোষক। আর যদি উচ্চতর বিষয় লইয়া উৎসব করিতে যাও, তাহা হইলেও তোমাকে ক্ষোভ পাইতে হইবে;

পৃথিবী তোমার তৃপ্তিকর দ্রব্য কখনই আয়োজন করিতে পারিবে না। তুমি ভাবিয়া দেখ, এখানকার ঘটনা-সূত্র তোমার ক্ষমতা অক্ষমতা ও সময় অসময়ের দিকে দৃক্‌পাত করে না। এখানকার বান্ধবেরা স্বার্থ-রক্ষাকেই তাহাদের প্রথম কর্ম্ম জ্ঞান করে। এখানকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান আর কাহারো সহিত তোমাকে মিলিতে দেয় না। এখানকার ধর্ম্মচিন্তা তোমাকে নির্জ্জন গৃহেই প্রেরণ করে। এ সকলই তোমার উৎসব বাসনার প্রতিকূল। তবে তুমি কেমন করিয়া তোমার এই উৎকৃষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিবে?

অতএব শান্ত হও। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে তোমার কল্যাণ অকল্যাণ বিবেচনা কর। তোমার জীবনের গতি ও উদ্দেশ্য চিন্তা কর এবং তোমার মত্ত মাতঙ্গ তুল্য বিবদমান প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত পথে চালিত কর। এইরূপে তোমার মনুষ্যত্ব স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে তোমার সুখ সৌভাগ্যের আর কিছুই অভাব থাকিবে না। ঈশ্বর তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। সেই অচিন্ত্য অনন্ত অবিনাশী পরম দেবতা আমাদের সকল আনন্দের আকরস্বরূপ। কি স্বর্গ লোকে কি মর্ত্ত্য লোকে ঈশ্বরের অধিক আর আমা-

দের কিছুই নাই। তিনিই আমাদের সকল সুখ ও সর্ব্ব সম্পৎ। হায়! শুনিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এই ক্ষুদ্র আত্মা সেই সকল ভুবনাধিপতি দেবাদিদেবের সহিত সহবাসের অধিকারী! ধন্য ধন্য সেই পতিত-পাবন মহেশ্বর! যিনি আমাদিগের ন্যায় অধম লোক সকলকেও উন্নত ও পবিত্র করিয়া লইবেন! ধন্য তোমার করুণা, হে জগদীশ্বর, ধন্য তোমার মহিমা!—হে ভ্রাতঃ! আর কি আমার কিছু বলিবার অবশিষ্ট আছে? তোমার উৎসবের কোন অভাব নাই; তোমার উৎসবের জন্য আর কোন প্রয়াস করিতে হইবে না; তোমার জন্য সকল সুখ সকল সম্পদ প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনই তাহা সম্ভোগ কর। ঈশ্বর প্রেমের আকর—আনন্দের নিলয়। তিনি তোমার দ্বার দেশে দণ্ডায়মান। হৃদয় উদ্ঘাটন কর, উৎসবামৃতে তোমার হৃদয়-কন্দর পূর্ণ হইবে! ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, হৃদয়গ্রন্থি উচ্ছেদ কর, প্রীতিকে প্রসারিত কর, ঈশ্বরে চিত্ত বিনিবেশিত কর, হে অমৃতপ্রয়াসী, এখনি ঈশ্বর তোমার আত্মার মধ্যে উদিত হইয়া সেখানে আনন্দ মহোৎসবের অক্ষয় প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। তখন সংসারের শোক তাপ দুঃখ ক্লেশ

কিছুই তোমাকে আক্রমণ করিবে না। বিপদের প্রবল ঝটিকা তোমরা অঙ্গকে সুমন্দ সমীরণ হইয়া স্পর্শ করিবে। তখন অন্তরে ও বাহিরে সকলেই তোমার আনন্দ ও মঙ্গল বিধান করিবে। তুমি এই মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াই স্বর্গের সুখ—স্বর্গের শান্তি—সম্ভোগ করিতে পারিবে। সেই আনন্দময়ের মঙ্গল হস্তে জীবন সমর্পণ করিলে তোমার সমুদায় আত্মা আলোকময় হইবে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব তোমার নিকট নূতন বেশ ধারণ করিবে। তখন তুমি অগ্র পশ্চাৎ চারি দিক কেবল দর্শন করিবে। এখন তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছ, তখন তাহাকে মহান্ বলিয়া বোধ করিবে। এখন যাহা দূরে দেখিতেছ, তখন তাহাকে অতি নিকটে সন্দর্শন করিবে। এখন যাহাকে সামান্যবৎ প্রতীতি করিতেছ, তখন তাহাকে আশ্চর্য্যময় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। এখন যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ দেখিতেছ না, তখন তাহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। তখন তোমার নিকটে এই সূর্য্য চন্দ্রের গতায়াত—এই মেঘ দলের সঞ্চরণ—এই বায়ুর হিল্লোল, সকলই জীবন্ত লোকের ন্যায়, ঈশ্বরের মহিমা গান করিয়া যাইতে থাকিবে।

তুমি মানবসমাজ দর্শন করিয়া কখন ঈশ্বরের অপার মহিমা অবলোকন করিবে, কখন তাঁহার অতুল করুণা উপলব্ধি করিবে, কখন তাঁহার পতিতপাবন নাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে,—এবং সকল সময়ে তাঁহার মহীয়ান্ ভাব হৃদগত করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিবে। ইহাই আমাদের মর্ত্ত্যলোকের উৎসব।

এইরূপে এখানকার উৎসব সমাপন করিয়া যখন তুমি দেবলোকে উত্থিত হইবে, তখন যে তুমি কি অনুপম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, মানবমনে তাহা অনুধাবন করিবার শক্তি নাই। যে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা এই মর্ত্ত্য লোককেই এরূপ বিচিত্র শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে কি অপূর্ব্ব রঞ্জনে স্বর্গ রাজ্যকে রঞ্জিত করিয়াছেন, হায়! মানব চক্ষু কিরূপে তাহার দর্শনসুখ অনুভব করিবে? যে আনন্দময়ী অখিলমাতা সংসারের এই সকল তরঙ্গমালার মধ্যেও আমাদের জন্য সুখের ভাণ্ডার সজ্জীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে সুধার ধাম আনন্দের আলয় স্বর্গ লোককে কি অমূল্য অতুল্য সুখে পূর্ণ করিয়াছেন; মানবরসনা কিরূপে তাহার স্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

হে উৎসব প্রয়াসী! সেই সকল অবিনশ্বর সুখসৌভাগ্য তোমারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি ক্ষুদ্র নহ। তুমি মহৎ। তুমি সকল প্রকার দীনতা ও মলিনতা পরিহার পূর্ব্বক সেই "মহতো মহীয়ান্" পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং তাঁহার অপার প্রেমের অনুকরণ করিয়া চিত্তক্ষেত্রকে উন্নত ও প্রসারিত কর। তুমি সেই আনন্দ-নিলয় মঙ্গলময়ের হস্তে তোমার জীবন সমর্পণ কর; স্বর্গ হইতে স্বর্গে—নবতর কল্যাণতর পথে বিচরণ করিয়া অনন্ত-কাল উৎসবামৃত-রস সম্ভোগ করিতে পারিবে।

আত্মশোধন।*

ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা বিবিধ প্রকারে মৃত্যুর প্রভাব ও মৃত্যুর সান্নিধ্য উদ্বোধন করিয়াছেন।

কৌরবগণের চিতানল নির্ব্বাণ করিয়া যুধিষ্ঠির মহা শোকে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতেছেন; ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন; রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া মৃত্যু সন্নিহিত বিবেচনা করিতেছেন;— ইত্যবসরে ধর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত ও গৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম ব্যাখ্যানে তাহাই উদ্বোধিত;—

'তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা না দিউক; এই হেতু সেই বেদ্য পরম পুরুষকে জান এবং তাঁহার শরণাপন্ন হও।

সংসার মৃত্যুর প্রতিকৃতি। এই হেতু প্রথমে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অসত্য হইতে সত্যে, অনিত্য হইতে নিত্যে, অসার হইতে সারসত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে এই মর্ত্ত্য লোকের মর্ত্ত্যত্ব চিন্তা করিতে হয়।

---

* ১৮১৩ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এই মৃত্যুর প্রতিকৃতি দেখিয়া শান্তি লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে সেই শান্তি লাভের উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রথমে সেই মৃত্যুকীর্ত্তন। একটি উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—

মৃত্যুনাহভ্যাহতো লোকো জরয়া পরিবারিতঃ।
অহোরাত্রাঃ পতন্ত্যেতে নন্বু কস্মান্ন বুধ্যসে॥
অমোঘা রাত্রয়শ্চাপি নিত্য মায়ান্তি যান্তি চ।
যদাহহমেতজ্জানামি ন মৃত্যুস্তিষ্ঠতীতি হ॥
সোহহং কথং প্রতীক্ষিষ্যে জ্ঞানেনাপিহিতশ্চরন্।
রাত্র্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামায়ুরল্পতরং যদা॥
তদৈব বন্ধ্যং দিবসমিতি বিদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
গাধোদকে মৎস্য ইব সুখং বিন্দেত কস্তদা॥
অনবাপ্তেষু কামেষু মৃত্যুরভ্যেতি মানবং।
পুষ্পাণীব বিচিন্বন্তমন্যত্র গতমানসং॥
বৃকীবোরণমাসাদ্য মৃত্যুরাদায় গচ্ছতি।

এখন কর্ত্তব্য কি? অতঃপর তাহারই উপদেশ। প্রথম উপদেশ এই যে, কালক্ষেপ করিও না।—

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো মা ত্বাং কালোহত্যগাদয়ং।
অকৃতেষ্বেব কার্য্যেষু মৃত্যুর্বৈ সংপ্রকর্ষতি॥

শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকং ।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতং ॥

প্রসিদ্ধি এই রূপ রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্ম সাধনের নিমিত্ত সাত দিবসের অবসর পাইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে আর ছয় দিন জীবিত থাকিতেও পারি; সপ্তম দিনে মৃত্যু নিশ্চিত। পরন্তু আমাদের মধ্যে কেহ কি বলিতে পারেন, আমি আর সাত দিবস জীবিত থাকিব ?

কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি।

অদ্যই কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে কে জানে ?

অতএব আমাদের ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত আর একদিনেরও বিলম্ব করিবার অবকাশ নাই। অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ঃ, যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, তাহা অদ্যই সম্পাদন কর; বর্ত্তমান সময়কে ব্যর্থ যাইতে দিও না। উপদেশকগণ আমাদের সকলকে এই সতর্ককর ঘোষণা দিয়া রাখিয়াছেন।

ধর্ম্মসাধন এমনি যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে দেখ দেখি, আমরা এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের কত ত্রুটী করিতেছি৷

বাস্তবিক প্রথম ত্রুটি এই যে আমরা জীবনকাল বৃথা ক্ষেপণ করি। আলস্য, ঔদাস্য ও অবহেলা কর্ত্তব্য কর্ম্মের

সাক্ষাৎ শত্রু। সময়ই আয়ু। আমরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া যত সময় অতিবাহন করি, ততটুকু আয়ুক্ষয় জনিত অপরাধগ্রস্থ হই।

আমাদের আর এক ত্রুটি এই ঘটে যে আমরা আপনাদিগকে স্ববশে রাখিতে পারি না। এই দোষে, আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান, পাপপুণ্যের বোধ বা আপনাদের প্রতি অন্যদীয় শাসন যাহা থাকে, তাহার কিছুই কার্য্যকারী হয় না। আমরা দেখিতে দেখিতে কুপথে যাই, জানিতে জানিতে মন্দ কর্ম্ম করি। চঞ্চল মনের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আত্মহারা হই। এ অবস্থায় আমাদের পাপ ও অপরাধ অপ্রতিকার্য্য হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ আমরা প্রবহমান কালের প্রতি লক্ষ্য রাখি না; অথচ মনে করি, আমরা দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব। এই বিশ্বাসে ভোগাভিলাষে অন্ধ হইয়া থাকি। সংসারকে সার জ্ঞান করি। তাহাতে আমাদের অহঙ্কার প্রবল হইয়া পড়ে।

অহঙ্কার আমাদের সকল কর্ত্তব্য নাশের ও অপরাধের নিদান। অহঙ্কার হইতে লোভ ও ভোগাসক্তি এবং তাহার ইতর বিশেষে অল্প বা অধিক কুটিলতা, কপটতা,

মিথ্যা, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ইত্যাদি সকল পাপ জন্মে। অহঙ্কার—প্রচ্ছন্ন ও নিগূঢ় অহঙ্কার—আমাদিগকে নানা প্রকারে বিভ্রান্ত করিয়া কত অপরাধ আনয়ন করে, কত অপরাধকে আবৃত করিয়া রাখে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা মোহান্ধ হইয়া তাহাদিগকে অপরাধ বলিয়া চিনিতেও পারি না।

এই অহঙ্কার বিনাশের নিমিত্ত আমাদের মৃত্যু, সংসারের অনিত্যতা এবং সারাসারের চিন্তা করিতে হয়। এই জন্যই উপদেষ্টাদিগের প্রধান ও প্রথম উপদেশ মৃত্যু।

অপরাধ ভঞ্জন।*

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে ভগবদুক্তি-রূপে এই সাধুলক্ষণ কথিত হইয়াছেঃ—

কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্‌গুণঃ।
কামৈরহতধী র্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ॥

এই গুলি যদি সাধুলক্ষণ হয়,—হায় আমরা এই সকল লক্ষণ হইতে কত দূরে আছি। আমরা যে শক্তি সামর্থ্য পাইয়াছিলাম, মনের যে সরলতা ও নির্ম্মলতা আমাদের স্বাভাবিক ছিল, আমরা তাহার কত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের যে মানসবিহঙ্গ অহরহ ঈশ্বরনাম গান করিবে, তাহাকে আমরা বিষয় রূপ ব্যাধের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমাদের যে হৃদয় ঈশ্বরপূজার পুষ্পস্বরূপ, তাহাকে আমরা ভোগবিলাসিতার শয্যাতলে বিদলিত করিতেছি। সর্ব্ব-

* ১৮১৭ শকের বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত।

জীবের পরিপোষণ কর্ত্তার প্রাকৃতিক পরিবেশন ক্রমে যে অন্নরাশি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, হায়, আমরা আত্মোদরের জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার কতই না অপচয় করিতেছি। যে সকল লোক দীন দরিদ্র দশায় পতিত হইয়া সাহায্যার্থ আমাদের মুখাপেক্ষা করিতেছে; হায়, স্বার্থপর হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি কতই কঠিন ব্যবহার করিতেছি। আমাদের যে জ্ঞানচক্ষু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ব্রহ্মধামের অনন্ত অক্ষয় মহৎ জ্যোতি দর্শন করিতে পারে, হায়! তাহাকে আমরা কি সঙ্কীর্ণ বিষয়কূপের অন্ধকারে আবদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছি।

যাহারা আমাদের জীবনদাতা, পোষণকর্ত্তা, শিক্ষক, বন্ধু, সহায়, আশ্রয় বা আশ্রিত, তাহাদের প্রতি আমরা কি অযোগ্য ব্যবহারই করিয়া থাকি? এই সংসারে আসিয়া যে সকল কর্ম্ম পাইয়াছিলাম, তাহারই বা কি সম্পাদন করিতে পারিলাম? যাহারা আমাদের পুত্র, কন্যা ও পরিবারের মধ্যে গণ্য, তাহাদিগকে কি আমরা উত্তম রূপে পালন করিতেছি? আমাদের সন্তানগণ কি আমাদের বংশের প্রদীপবৎ উজ্জ্বলকারী বংশধর হইতে পারিয়াছে?

যাহাদিগকে প্রতিবেশী বলি,—যাহাকে আমরা স্বর্গাদপী গরীয়সী জন্মভূমি বলি, যে পৃথিবীর বক্ষে লালিত পালিত হইয়া উহাকে আমরা ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের প্রতি কি আমরা সুপুরুষোচিত ব্যবহার করিতে পারিতেছি? এতাবৎ বিষয়ে আমাদের যে কর্ত্তব্য ছিল, হায়, তাহার কতই ত্রুটি রহিয়া যাইতেছে—কতই পাপ তাপ অপরাধ আমাদিগকে দণ্ডার্হ করিয়া তুলিয়াছে।

অথচ মৃত্যু সন্নিকট। শীঘ্র শীঘ্রই আমাদিগকে এই অপ্রস্তুত, অসংশোধিত, অপরাধবিশিষ্ট অবস্থায় এই মর্ত্ত্য লোক ত্যাগ করিতে হইবে। আর সপ্তাহকাল কর্ম্ম করিতে পারিব এমনও কোন স্থিরতা নাই। ক্রমশঃ আমাদের সকল শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে; এমন কোন উপায় নাই যাহাতে অল্পকাল মধ্যে আমাদের অকৃত কর্ত্তব্যের সম্পাদন হইতে পারে—এমন কোন পন্থা নাই যাহাতে অচিরকাল মধ্যে লক্ষ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারি।

এমন অবস্থায় আমরা সেই অশরণের শরণ, জগদ্বন্ধুকে ডাকিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁহাকে ডাকি! তিনি কোথায়, তিনি কেমন, তাহা না জানিয়াও তাঁহাকে ডাকি! তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিব না। যতো-

বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,—তাঁহাকে কিরূপেই বা জানিব ? আমাদের বাগ্‌জাল, তর্কবুদ্ধি, বিচারশক্তি, দিব্যদর্শন, সকলকেই অতিক্রম করিয়া, তিনি দুরাৎ সুদূরে ! তিনি গুহান্তনিহিত হইয়া গুঢ়রূপে রহিয়াছেন !

আমরা ঈশ্বরকে না চাহিলেও তিনি আমাদিগকে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া পোষণ করিতেছেন। আমাদের পাপ অপরাধ মোচন করিয়া তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া লইবেন। ঈশ্বর আমাদের নিরাশার আশা ; সঙ্কটের রক্ষা স্থল, অগতির গতি : এবং সর্ব্বাবস্থাতেই শরণ্য। তিনি আমাদের মৃত্যুর মধ্যে অমৃত স্বরূপ, অনিত্যের মধ্যে নিত্যস্বরূপ এবং শূন্যতার মধ্যে পূর্ণস্বরূপ। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করি, তাঁহাকে আশ্রয় করি। তাহাতে সর্ব্বারোগ্য ও সর্ব্বশুদ্ধি লাভ হয়, এবং আমরা আপ্তকাম হই। যদি কাল সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, এখনি আমরা এই মর্ত্ত্য লোক স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। কেবল প্রার্থনা এই যে পতিতপাবন দয়াময় ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

হে ঈশ্বর ! আমরা যতই অপরাধী হই, তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া অমৃত ধামে লইয়া যাইবে। তোমার

অপার করুণাগুণে আমাদের উদ্ধার হইবে। এই আমাদের ভরসা। আমরা অকৃতী, অধম, হীন ও দীন। কেবল তোমারই কৃপায় যেমন আমরা তোমার অমৃত নিকেতনের ও মঙ্গলচ্ছায়ার নিদর্শন পাইতেছি—যেমন অল্পে অল্পে তোমার পবিত্র জ্যোতির বিভাস অবলোকন করিতেছি, তেমনি আবার আমাদের পাপ অপরাধ, মলিনতা ও হীনতা অনুভব করিতেছি। কাল স্বল্প। আমাদের শক্তি কিছু নাই।

তুঁহু জগতারণ দীন দয়াময়,
অভয়ে তোঁহারি বিশ্বাসা।

তোমার পবিত্র মঙ্গল জ্যোতির দিকে চাহিয়া অপরাধ-সহস্র-সঙ্কুল আপনার মলিনতা দর্শনে কাতর হইয়া পড়ি। কেবল তোমার কৃপা ভরসা। পাপ মোচনের জন্য অপরাধ ভঞ্জনের জন্য কেবল এই প্রার্থনা করি—

অজ্ঞত্বাদ্ধীনশক্তিত্বাদালস্যাদ্দুষ্ট ভাবনাৎ।
কৃতাপরাধং কৃপণংক্ষন্ত মর্হসি মাং বিভো॥
অপরাধসহস্রাণাং সহস্রমযুতং তথা।
অর্ব্বুদং চাপ্যসংখ্যেয়ং করুণাব্ধে ক্ষমস্ব মে॥

অকিঞ্চনতা।

"সম্পদঃ পদমাপদাং"। সম্পদ নানা আপদের মূল। হিতোপদেশাদিগ্রন্থে এই উপদেশ বালকদিগকেও প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার অর্থ অতি গভীর।

আপদ দ্বিবিধ, দৈব ও মানুষ। দুর্ভিক্ষাদি ঘটনা দৈব আপদ; চৌর্য্যাদি ঘটনা মানুষ আপদ। সম্পদে উক্ত দৈবী ও মানুষী সমস্ত আপদ বর্ত্তে। তদতিরিক্ত আরো একপ্রকার আপদ আছে। তাহা মনুষ্যের প্রবৃত্তি পরিচালন দোষে সংঘটিত হয়। ক্রোধ লোভাদি রিপু-জনিত আপদকে সেই শ্রেণীতে গণ্য করা যায়। এতন্মধ্যে চৌর্য্য দুর্ভিক্ষাদি আপদ নিবারণের জন্য রাজা ও জন সমাজস্থ লোকেরা পরস্পর চেষ্টা করিতে পারেন। শেষোক্ত আপদ প্রশমন করা মনুষ্যের নিজের হস্তে। এ অপরাধ তাহার নিজ কৃত এবং সে নিজে তাহার ফল-ভাগী।

মনুষ্য ধন মান ঐশ্বর্য্যাদি সম্পদ লাভের নিমিত্ত নিতান্ত লালায়িত। সে তাহার জন্য দুঃসহ ক্লেশ রাশি সহ্য করে। এত করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহার উপরে অবশ্যই অত্যন্ত মমতা আইসে। যখন দেখে যে তাদৃশ

সম্পদ বহু ব্যক্তির নাই, তখন মনে অহঙ্কার জন্মে। সম্পদ-হেতু অহঙ্কারী ব্যক্তি যখন দেখে যে ধন দ্বারা সে বহু কার্য্য সাধন করিতেছে, শত শত লোক তাহার তোষা-মোদ করিতেছে, তখন তাহার অহঙ্কার অনিবার্য্যরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অহঙ্কারের সঙ্গে তাহার লোভ ক্রোধাদি রিপু অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ধৈর্য্য থাকে না। সে উন্মত্তের ন্যায় হয়। এরূপ লোকের প্রসাদও ভয়ঙ্কর।

ক্বচিদ্রুষ্টঃ ক্বচিত্তুষ্টঃ রুষ্ট স্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ততা তাহার যেন স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, ক্রোধাহঙ্কারাদি-রিপু-পরতন্ত্র ধনবান ব্যক্তি, পৃথিবী প্রদান করিতে চাহি-লেও লোকে তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয় না।

ধনবান্ ক্রোধলোভাভ্যামাবিষ্টো নষ্টচেতনঃ।
তীর্য্যগীক্ষঃ শুষ্কমুখঃ পাপকো ভ্রুকুটীমুখঃ॥
নির্দ্দশন্নধরোষ্ঠঞ্চ ক্রুদ্ধো দারুণভাষিতা।
কস্তমিচ্ছেৎ পরিদ্রষ্টুং দাতুমিচ্ছতি চেন্মহীং॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৭৬ অঃ।

ধনবান ব্যক্তি ক্রোধ লোভের বশীভূত, নষ্টচেতন, বক্রদৃষ্টি, শুষ্কমুখ হইয়া ভ্রুকুটিভঙ্গ ও অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া সক্রোধে দুর্ব্বাক্য ব্যবহার করে। এরূপ ব্যক্তি পৃথিবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেও কেহ তাহার মুখ দেখিতে চায় না।

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা।

ক্রোধ হইতে মোহ জন্মে, মোহ হেতু স্মৃতি নাশ হয়। স্মৃতি নাশ হইলে বুদ্ধিও বিনষ্ট হয়। বুদ্ধি নষ্ট হইলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকারেই বিনাশ হইল।

কেবল ধন হেতু অহঙ্কার হয় এমন নহে। যৌবন, রূপ, মান, কুলমর্য্যাদা এ সকলও অহঙ্কারের কারণ।

অভিজাতোস্মি, শুদ্ধোস্মি, নাস্মি কেবল মানুষঃ।

এরূপ গর্ব্বপূর্ণ আস্ফালনে কত লোক আপনার অতি-মনুষ্যত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রকারেরা একারণ আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক তাপ-ত্রয়ের সূচনা করিয়াছেন।

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিরক্ষণে ॥
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং ক্লেশকারিণং ॥

ধন উপার্জ্জনে ও তাহার পরিরক্ষণে নানাবিধ ক্লেশ উপস্থিত হয়। ধন নাশে ধন ব্যয়েও দুঃখ জন্মে। অতএব এরূপ ক্লেশকর অর্থকে ধিক্।

ধনের সহিত বহু অনর্থের যোগ দেখাইয়া, শাস্ত্রকারেরা ত্যাগের প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া রাখিতে সর্ব্বদা উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা ত্যাগকে এক প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং শাস্ত্রে ত্যাগের বিধিও প্রদর্শন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে রাজগণ যেমন অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা আপনাদের মহিমা বিদ্যোতিত করিতেন, তেমনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া ত্যাগের পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়। এই যজ্ঞের বিধান মতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী মহাত্মারাও অকিঞ্চন-ভাবে অবস্থান করিতেন। ত্যাগ-ধর্ম্মের নিদর্শন স্বরূপ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত।

কথিত আছে সূর্য্যবংশাবতংস পৃথ্বীশ্বর রঘু এ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়া একান্ত অকিঞ্চনতা প্রাপ্ত হইলে,

গুরুদক্ষিণার্থী কৌৎস ঋষি ধন যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন মৃন্ময় পাত্র ভিন্ন রাজার আর কোন বিভব ছিল না। অকিঞ্চন রঘুর সেই মৃৎপাত্রশেষা বিভূতির ফলেই রাঘব বংশের নাম চিরমহিমান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

এইরূপ ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ না করিলে, অথবা বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন না করিলে, যে ত্যাগধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না, এমন নহে। অনাসক্তিই ত্যাগের প্রধান ও মূলগত লক্ষণ। বিপুল সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়াও যে ত্যাগ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে, রাজর্ষি জনক তাহার উদাহরণ। বিদেহাধিপতি মহাত্মা জনক বলিয়াছিলেন—

"অনন্তং বত মে বিত্তং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।"

আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু এ সকল আমার কিছুই নহে; অতএব আমি অকিঞ্চন। সুতরাং

"মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন।"

সমস্ত মিথিলা নগরী অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। ফলতঃ সকল ঐশ্বর্য্যের মূলে ত্যাগ-ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বাংশে সুখী হয়, এবং ধনাদিরও

যথোচিত সদ্ব্যবহার ও সার্থকতা হয়। সুবৃহৎ ভারত-গ্রন্থে সম্পদের দুঃখময় পরিণাম এবং ত্যাগ ধর্ম্মের নিত্য শান্তি, সহস্র উদাহরণ দ্বারা অতি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

ধনমান-ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া কৌরবাদির বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। তাঁহারা আপনারাও উৎসন্ন হইলেন; এবং সমস্ত ভারতকে চিরদিনের মত অবনতির গভীর খাতে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

যাজ্ঞসেনীর প্রতি দুঃশাসনকৃত অপমান হেতু ভীমসেন রাক্ষস তুল্য রক্ত-পিপাসু হইয়াছিলেন। রাজ্য-লাভ জন্য জঘন্য হত্যা করিলে কি ঘোরতর মহাপাপ হয়, তাহা স্মরণ করিয়া কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়ের শরীর বিকম্পিত হইলেও এমনি সংসারচক্র—এমনি বিষয়-ব্যামোহ, যে তিনিও পরিশেষে স্বহস্তে কৌরব বংশের ও তাহার সঙ্গে অর্দ্ধ মনুজমণ্ডলীর বিনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের অবসান হইল। পাণ্ডবদিগের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারতাকাশে উড্ডীন হইল। কিন্তু তাহাতে কি পাণ্ডবেরা সুখী হইতে পারিয়াছিলেন? যাহা লব্ধ হয় নাই, তাহা অমরাবতীর মকরন্দবিনিন্দিত অপূর্ব্ব

মধুর পদার্থ বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু লব্ধ হইলে আর তাহা তেমনি সুখদায়ক থাকে না।

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজ্যসুখ ভোগ করিলেন না ; শোকে তাপে ঘৃণায় নির্ব্বেদে ও মর্ম্মপীড়নে আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি হস্তিনায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না। কৌরবদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের পরেই তিনি বিরাগী হইয়া গঙ্গাতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁহার অন্তঃকরণের পীড়ার অপনয়ন হইল না। তিনি শান্তিলাভার্থ সবান্ধবে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহামতি ভীষ্ম নিজেই শরবিদ্ধ। কুরুক্ষেত্র শ্মশানপূজার তিনিই প্রথম বলি। কিন্তু এখনও তাঁহার মহাপ্রাণ একবারে চলিয়া যায় নাই। যুধিষ্ঠির শোকাপনোদন জন্য সেই শরশয্যাশায়ী পিতামহের পদতলে আশ্রয় লইলেন। প্রজ্ঞাবান ভীষ্মদেব শোকসন্তপ্ত রাজাকে রাজধর্ম্মের এবং মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই, যে "সর্ব্বং ত্যক্ত্বা সুখীভব।" তুমি রাজ্যে ধনৈশ্বর্য্যে সুখ পাইবে না, এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সুখী হও ; তুমি অকিঞ্চনতা অবলম্বন কর ; ইহাতেই পরম মঙ্গল লাভ হইবে।

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অতিরিচ্যতে দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥
আকিঞ্চন্যে চ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নোহি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা ॥
নৈবাস্যাগ্নি র্ন চারিষ্টো ন মৃত্যু র্ন চ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরামিষঃ ॥
অকিঞ্চনঃ সুখং শেতে সমুত্তিষ্ঠতি চৈব হ।
আকিঞ্চন্যং সুখং লোকে পথ্যং শিবমনাময়ং ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৬ অধ্যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ* ।

এই উৎসবাধিষ্ঠাতা নিখিল বিধাতার বরণীয় পদে বার বার নমস্কার। তাঁহার কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করি। হে দেব! প্রসন্ন হও, হে দেব প্রসন্ন হও।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের একটী বিশেষ লক্ষণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পারায়ণ। অদ্য প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়াহ্নে এই অনুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন হইল। অদ্যকার উৎসব ক্ষেত্রে আমরা সঙ্কল্পারূঢ় হইতেছি যে, এই শুভ অনুষ্ঠান যাহাতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় তাহার চেষ্টা করিব। সিদ্ধিদাতা বিধাতা আমাদের সহায় হউন।

পারায়ণ শব্দের অর্থ এক গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ। নিয়ম পূর্ব্বক পাঠ আরম্ভ ও সমাপ্ত করা আবশ্যক। আমরা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন ব্রত বিধিপূর্ব্বক অবলম্বন ও তাহার উদ্‌যাপন করি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এক ব্রত বিশেষ। তাহা তদ্রূপে সম্পাদন

---

* এই প্রবন্ধ বিগত ১৮১৭ শকের ৩০ শে কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় পঠিত এবং পৌষের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

করা উচিত। বেহালা ব্রাহ্মসমাজে এই অনুষ্ঠানের আরম্ভ হইয়া তাহা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

পরন্তু, ইহা কেবল একদিনের ব্রত হওয়াও বিহিত নহে। অর্থবোধ সমেত, ধর্ম্ম চিন্তা সমেত, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সমেত পাঠ না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠের কোন ফল হইবে না। এই পারায়ণে আমাদের বাক্য শুদ্ধ হইবে, স্বর সুমিষ্ট হইবে, কর্ণ পরিতৃপ্ত হইবে, এবং প্রাণের সহিত সকল অঙ্গ অমৃতাভিষিক্ত হইবে। এই মহদর্থ সাধনার নিমিত্ত ইহার নিয়ম এই থাকুক যে, প্রতিদিন শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে একটী করিয়া মন্ত্র পাঠ হইবে; এবং সমস্ত বৎসরের মধ্যে পারায়ণ সম্পূর্ণ হইবে। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৭ + ১৩৮ = ২৯৫ সংখ্যক মন্ত্র আছে। বাধা বিঘ্ন প্রযুক্ত ৭০ দিবস পাঠ না হইলেও সম্বৎসরে ৩৬৫ দিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের এক আবৃত্তি অনায়াসে সম্পূর্ণ হইতে পারিবে! অথবা প্রতি সপ্তাহে একদিন ৭টী করিয়া মন্ত্র পাঠ করিলে ৪২ সপ্তাহে পাঠ সমাপ্ত হইবে। আর ১০ সপ্তাহ কাল বিভিন্ন কারণে ব্যাহত হইলেও সম্বৎসরে এই পারায়ণ ব্রতের উদ্‌যাপন কঠিন হইবে না।

প্রাচীন ব্যবস্থা এই ঃ—

তপোবিশেষৈর্বিবিধৈর্ব্রতৈশ্চ বিধিচোদিতৈঃ।
বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ সরহস্যো দ্বিজন্মনা ॥

মনু ২। ১৬৫

বিশেষ তপ অর্থাৎ নিয়ম কলাপ এবং নিত্য স্নানাদি বিবিধ ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক বেদ ও উপনিষৎ সম্যক্ অধ্যয়ন করিবে।

আমরা সেই বেদ প্রাপ্ত হইয়াছি ; কিন্তু ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা পাঠ করি না। এজন্য তাহার অধিগম আমাদের ঘটে নাই। তাহার ফলও আমাদের কর্ম্মানু-রূপ হইতেছে না। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বেদ, তদ্‌বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই ; সংযত হইয়া ইহা নিত্য অধ্যয়ন এবং বর্ষে বর্ষে ইহার এক আবৃত্তি বা পারায়ণ সম্পূর্ণ করিলে আমাদের বেদাধ্যয়ন ব্রত সিদ্ধ হয়। এই বেদাধ্যয়নের কি ফল হইবে, সে ফলশ্রুতি কথায় ব্যক্ত হইবার নহে। তাহার অনুষ্ঠান ভিন্ন সে ফল বিদিত হইবে না।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ কি প্রকার বেদ এবং ইহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নাম কেন ? তাহার আলোচনা আবশ্যক। সকল বিষয়ে জ্ঞান সুস্পষ্ট হওয়া উচিত।

পরাশর বলিয়াছেন—

> ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।
> তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে॥

—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি ও স্মৃতি চির দিন সমান জাগ্রত থাকে না। তদুক্ত ধর্ম্মের তথ্য কালে কালে সমুদিত হয়। ভারতে আদিম কালের শ্রুতি ও স্মৃতির যদিও একান্ত বিলোপ হয় নাই, কিন্তু অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন দশা ঘটিয়াছিল। ভারতের রাজধানী এই কলিকাতায় নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সুশিক্ষিত যুবক তত্ত্ববোধের নিমিত্ত যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, ধর্ম্ম বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে শান্তি অপেক্ষা অশান্তি অধিক ঘটিয়াছে। আর ধর্ম্ম সম্পর্কে মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাবের কোন সম্ভাবনাই নাই। কারণ প্রসিদ্ধ আছে যে—

> বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,
> নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

সুশিক্ষিতগণের এই তর্কের তরঙ্গে যখন বঙ্গদেশ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সঙ্কট সময়ে বিধাতা শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মুখ হইতে এই পুরাতন শ্রুতি

বাক্য সকল নির্গত করিলেন। শ্রীমন্মহর্ষি সমস্ত উপনিষদ্ যেমন পাঠ করিয়াছিলেন, তদুক্ত সার সার বাক্য সকল তাঁহার হৃদয়ে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছিল। প্রতিবাদীরা ধর্ম্মের অনিশ্চিততা প্রতিপাদন জন্য ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত করিলে সেই সকল অবিনশ্বর সত্যবাক্য তাঁহার জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তাহাই সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

ঈশ্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অথবা সমস্ত বঙ্গদেশের প্রতি এই যে কৃপা বর্ষণ করিলেন, অচিরকাল মধ্যে তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ। শ্রুতির অনুগত হইয়া স্মৃতি সকলও প্রকাশিত হইল। দুইখণ্ডে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পূর্ণাকার ধারণ করিল। সংক্ষেপে ও সুবিস্তারে এই সকল মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের কর্ণ পবিত্র হইল। স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণার উপযোগী এতাবৎ উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া লোকের ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ হইল। বঙ্গদেশ প্রশান্ত হইল। এইরূপে নির্দ্বন্দ্ব নিঃসন্দেহ, তর্কাতীত, চির ক্রমাগত, বিশ্বমান্য, সুনিশ্চিতার্থ শাস্ত্র বাক্য সকল বঙ্গভাষায় টীকা ও ভাষ্য সমেত এক গ্রন্থবদ্ধ হইল।

মনু সংহিতায় কথিত হইয়াছে,—শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং ইত্যাদি (২।৯) অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতিতে যাহা বিহিত, তাহাই ধর্ম্ম; তাহার আচরণ করিয়া মনুষ্য ইহ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। এই লক্ষণে শ্রুতি ও স্মৃতি মন্ত্রযুক্ত এই গ্রন্থের 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নাম অবশ্যই সিদ্ধ বলিতে হইবে। ইহা ভিন্ন এতৎ প্রকৃতিবাচক অন্য নাম হইতে পারে না।

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।

আদি কাল হইতে রচিত ও সঙ্কলিত কত শাস্ত্র এখনো বর্ত্তমান, তাহার অন্ত নাই। জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতি আবশ্যক। নতুবা সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার বিদূরিত হয় না। কাল স্বল্প; মনুষ্যের আয়ুষ্কালের মধ্যে অতি অল্প কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে, অথচ বিঘ্ন বহু প্রকার। এই অল্প জীবন কালের মধ্যেও কি সকল সময়ে আমরা শাস্ত্র পাঠ করিতে সমর্থ হই? অতএব উপদেশ এই:—

যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং।

যাহা সারভূত সেই শাস্ত্রের চর্চ্চা করা আবশ্যক। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সংকলন প্রয়োজনীয় হইয়াছিল।

এবং সেই কারণেই বঙ্গীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা অতীব আগ্রহের সহিত তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

যে উদ্দেশে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বাংশে সফল বলিতে হয়। কিঞ্চিতুন পঞ্চাশ বৎসর এই গ্রন্থ উদিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বজনবোধগম্য সংক্ষিপ্ত অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দিগ্‌দিগন্তে সর্ব্ব শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বী লোকের গোচর হইয়াছে। কেহ সপক্ষভাবে, কেহ বিপক্ষভাবে, এই গ্রন্থের সূক্ষ্ম সমালোচনাও করিয়াছেন। পরন্তু সর্ব্বমতের লোকের নিকট ইহার সমাদর হইয়াছে।

সম্প্রতি যাঁহারা সমগ্র বেদ বেদান্ত স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই গ্রন্থকে হয়ত ক্ষুদ্র বলিবেন। যিনি কোন মত বিশেষের পক্ষপাতী, তিনি তাঁহার সেই মতটী ইহাতে পরিস্ফুট না দেখিয়া হয়ত ইহাকে অসম্পূর্ণ বলিবেন। কিন্তু সে দোষ পরিহার করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। সকল মতাবলম্বীর পক্ষে ঐক্য স্থল প্রদর্শন করা অথচ মনুষ্যের মুখ্য ধর্ম্ম ব্যক্ত করা, এই অমূল্য গ্রন্থের তাৎপর্য্য। গ্রন্থ প্রকাশের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে সর্ব্ববাদিসম্মত, আত্মার

তৃপ্তিকর, শান্তিপ্রদ গ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ সৎপুরুষদিগের অতি আদরের বস্তু, তাহা এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসেই অখণ্ডিতরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশবাসী, নানা ভাষায় পণ্ডিত, নানা ধর্ম্মে দীক্ষিত, নানা মতাবলম্বী ব্যক্তি, এই সর্ব্ব প্রাচীন ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন মহাসার মহা-বাক্যে পরিতৃপ্তিলাভ করিতেছেন, এবং চিরদিন তাহা করিতে থাকিবেন।

যদি এই গ্রন্থের উদয় না হইত এবং ইহার সহিত অন্যান্য বহুল বেদবাক্যের অতি বিশদ মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে প্রকাশিত না হইত, তাহা হইলে আজি বঙ্গীয় সমাজে ধর্ম্মালোচনার গতি কিরূপ হইত, তাহা অনুমান করা সুকঠিন। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের এই নবাভ্যুদয়ের ইতিহাস সম্যক আলোচনা করিবেন, তাঁহারাই এই তথ্য জানিতে পারিবেন।

পূর্ব্বের ব্রহ্ম সংসৎ এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজরূপে পুনরাবির্ভূত। পূর্ব্বের শাস্ত্র সকল এই প্রকারে পুনরুদিত। আমাদের যদি যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা জন্মে,—যদি আমরা এই ধর্ম্মগ্রন্থ সম-ন্বিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যথাবিধি সম্পাদন করিতে পারি, তবে সেই প্রাচীন কালের সত্য, সারল্য, ধ্যান, জ্ঞান ও ব্রহ্ম

যোগ অচিরাৎ পৃথিবী মণ্ডলে পুনঃ পরিব্যাপ্ত হইবে। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ মস্তকে ধরিয়া আমরা দেশ দেশান্তরে, দ্বীপ দ্বীপান্তরে পিতৃপুরুষদিগের পূজিত পবিত্র পরমেশ্বরের বন্দনা ও আরাধনা করিব। ঈশ্বরের প্রসাদ, আর্য্য ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ সহকৃত হইয়া সর্ব্বত্রই আমাদিগের এবং লোক সাধারণের কল্যাণ সাধন করিবে।

প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্র সকল নানা রূপে গ্রথিত, নানা প্রকারে আহরিত এবং নানা ধারায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। এক এক শাস্ত্রের সকল বচন সেই শাস্ত্র রচয়িতার হৃদয়স্ফূর্ত্ত নয়; বহু বাক্য শাস্ত্রান্তর হইতে গৃহীত হইয়া থাকে। এক এক গ্রন্থের বাক্য লইয়া অন্য গ্রন্থ সংকলন করা প্রাচীন রীতিসিদ্ধ বলিতে হইবে।

"অজোনিতঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

এই বাক্য যেমন কঠোপনিষদে, তেমনি গীতা গ্রন্থে অবিকল রহিয়াছে।

কঠ ২।১৮; গীতা ২।২০।

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত মন্ত্র উপনিষদেও অবিকল দৃষ্ট হয়।

'সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং'।

"সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং"।

ইত্যাদি বাক্য যেমন শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বচন তেমনি গীতার বচন বলিয়া প্রথিত।

গীতা। ১৩।১৩।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং"

ইত্যাদি মন্ত্র কঠ, শ্বেতাশ্বতর এবং মুণ্ডক এই তিন উপনিষদেই বর্ত্তমান।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ

১৫।৬

এই গীতা বাক্য পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের অনুকৃতি মাত্র।

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে, একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ চণ্ডী গ্রন্থের—'একৈবাহং জগত্যত্র' বাক্য তাহারই প্রতিধ্বনি ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রুতি বলেন।

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাৎ

ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণঃ। মুণ্ডক ২।২

গীতা ঐ বাক্য প্রকারান্তর করিয়া বলেন :—'

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে

নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ। ১১।৪০

এইরূপে এক শাস্ত্রের বাক্য অবিকল গ্রহণ বা কিঞ্চিত পরিবর্ত্তন করিয়া অপর গ্রন্থ রচনা করা দূষণীয় নহে। এবম্প্রকারে এক শাস্ত্রের বাক্য শাস্ত্রান্তরে কতই রহিয়াছে; কে তাহার গণনা করে? আর তাহার গণনা করিবার প্রয়োজনই বা কি? মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞানকে চিরশ্রুত সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্যে উপযুক্তরূপে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া মাত্র ধর্ম্মগ্রন্থের অভিলক্ষিত। তন্নিমিত্ত শ্রুতিবাক্যময় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডকে উপনিষৎ বলিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

গীতা মাহাত্ম্যে কথিত হয় যে, সর্ব্বোপনিষদ্ গাভী স্বরূপ, পার্থ তাহার বৎস স্বরূপ, এবং গীতা ক্ষীর স্বরূপ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে প্রসবিনী গাভীতুল্য সর্ব্ব উপনিষৎ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান। পাঠকেরাই তাহার বৎস। সেই ব্যক্তি ধন্য, যিনি এমন সাক্ষাৎ কামদুঘা সুরভির নিকট জীবনের সমস্ত শুভ ফল লাভ করিতে পারেন।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে কোন উপাখ্যান নাই; সাধন ভজনের কোন উদাহরণ নাই; আচার্য্য ও শিষ্যের প্রসঙ্গ নাই; কিন্তু মূল সূত্ররূপে সে সমস্তই আছে। পাঠকালে তৎ সমুদায় অনুভূত হয়, এবং ব্যাখ্যায় তাহা

পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ এই গ্রন্থকে ভারতীয় চারি যুগের জ্ঞানভাণ্ডার বলিতে পারা যায়। ইহার প্রথম বাক্যেই ভারতের বিস্তৃত ইতিহাস সূচিত হয়। যথা 'ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি'। ব্রহ্মবাদিরা বলেন। সেই ব্রহ্মবাদিরা আবার কি বলেন?

'ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেন স্তদ্ব্যাচচক্ষিরে'।

যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্ম বিষয় ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন, তাহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

শ্রুতি স্মৃতি সম্পৃক্ত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে এক কালে দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করা হয়। ইহার পাঠে দেবপ্রসাদ্ সদ্যই অনুভূত হইতে থাকে। ইহাতে ঋষিদিগের প্রীতি জন্মে। ইহা পিতৃ পুরুষদিগের কর্ণ পবিত্র করে।

এই শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যাবলী যেমন ঈশ্বরের ধ্যান ধারণায় অনুকূল হয়, তেমনি দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপদ ঘটনায় অবসন্ন চিত্তকে বলীয়ান করে। ইহার প্রভাবে শোক, তাপ ও পাপ প্রবৃত্তি দূরে প্রস্থান করে। ইহার দ্বারা সকল প্রকার ক্ষীণতা অপগত ও শক্তি-সঞ্চারিত হয়। মোহ রোগের ইহা ভিন্ন আর ঔষধ নাই।

য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্ ব্রহ্মসংসদি।
প্রয়তঃ শ্রাদ্ধ কালে বা তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

কঠোপনিষৎ।

ভক্তি-নম্র, প্রেমার্দ্র, শুদ্ধ, সরল হৃদয়ে লোক-মঙ্গল-সঙ্কল্পে যিনি এই গ্রন্থ ও তাহার অর্থ অপরকে শ্রবণ করান, তাহারও কল্যাণ লাভ হয়।

অতএব মহোৎসবে, শ্রাদ্ধকালে, নির্জ্জনে, ব্রহ্মসংসতে, ও বিপদপাতে এই গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত পারায়ণ নিয়মে পাঠ করিলে এই শাস্ত্র অচিরে অধিগত ও সম্যক্ ফলপ্রদ হইবে।

এক্ষণে প্রার্থনা এই ঃ—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণ মস্ত নিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়িসন্তু॥

হে ঈশ্বর! বিদ্যার সার, শাস্ত্রের প্রধান, বিবেকের দীপ, এই আদি বাক্যে তুমি আমাদিগকে নিয়োগ কর। আমাদিগকে সংযমী ও ব্রতশীল কর। এই সঙ্কল্পে—, এই ব্রতনিয়মে তোমার আদেশ ও উপদেশ পালন করিবার শক্তি তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে প্রেরণ কর।

৬ই ভাদ্র।*

১। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া ইহা স্মরণ করিলে পরমানন্দ পাইবেন।

২। ব্রহ্মমন্ত্রের জ্যোতিঃ এই দিনে ভারতে পুনরুদ্দীপ্ত হয়। সে জ্যোতির বিস্তারে অজ্ঞান ধ্বংস হইতেছে। সুপ্তোত্থিত জনগণের জাগ্রদবস্থার বিবিধ কর্ম্ম দেখা যাইতেছে।

৩। এই দিনে কেবল ভারতবাসীরা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এমন নয়। ঐ দিনের জাগরণে সমস্ত পৃথিবীর লোক একত্রিত হইবেন, এমন উপক্রম হইয়াছিল।

৪। ঐ জাগরণে মোহ অন্ধকার অর্থাৎ বিষয়াসক্তি দূর করিবার উদ্যম ছিল। দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ ও হিংসাদি উপদ্রবকে গণ্ডীর বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৫। কালের প্রবাহে যাহারা জাতিমাত্রে বুদ্ধ ছিলেন; এবং যাহারা বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, সকলে প্রবুদ্ধ লক্ষণ পাইলেন। "প্রবুদ্ধ ভারত" নাম পরিস্ফুট হইল।

---

* ১৮১৮ শকের আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত।

৬। প্রবুদ্ধ ভারতের নানা কর্ম্ম। কর্ম্মের সম্পাদনে প্রতিজ্ঞা চাহি। প্রতিজ্ঞায় দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব হেতু ক্লেশ ঘটিলে সহিষ্ণুতা আবশ্যক। সহিষ্ণুতায় তপস্যা হয়।

৭। তপস্যার মুখ্য কাল পড়িয়াছে। অতীত শত বৎসরের ব্যাপার স্মরণ করিতে করিতে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র মনে পড়িল। বহু তপস্যার পুণ্য-প্রবাহের মুখ এই দিনে খুলিয়াছিল।

৮। ব্রাহ্মেরা এই শত বৎসরের লোক। অথবা এমন বলা যায়, ব্রাহ্মেরা এই শত বৎসরের ব্রাহ্ম তপস্বী-দিগের গুণধর সন্তান। তাঁহারা ৬ই ভাদ্রকে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত স্মরণ করিবেন।

৯। বর্ত্তমানকাল বচনের কাল নহে; কর্ম্মের কাল। এ দিনে পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মরণ ব্যর্থ যাইবার নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার ফল ফলিবে। কর্ম্মক্ষেত্র স্বদেশ। আমাদের পক্ষে কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি।

১০। "দেব-দ্বিজ গুরু-প্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবং" এই বাক্য ভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র। ৬ই ভাদ্র দিবসে ব্রাহ্ম-দিগের এই মন্ত্র স্মরণীয় ও চিন্তনীয়।

১১। এতন্নিমিত্ত কি চাহি? তপস্যা। তপস্যায় জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক। তপস্বীজন আপনার সর্ব্বশক্তি তল্লক্ষ্য সাধনে নিয়োগ করিবেন।

১২। তপস্যার প্রখ্যাত লক্ষণ ঊর্দ্ধ বাহু। তদ্রূপে অপরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইবে; কেবল ঈশ্বরের প্রসাদ চাহিবে। এই ঐকান্তিক নিরন্তর তপস্যায় বল বুদ্ধি গতি ও মুক্তি সমস্ত ঈশ্বর হইতে পাইবে।

রাজা
রামমোহন রায়।

আর্য্যাবর্ত্তবাসী সমস্ত লোক যে সময় তর্পণ প্রকরণে পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর দিবস স্মরণার্থ উপস্থিত হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ব্রিষ্টলের এক উদ্যান বাটিকায় কলেবর ত্যাগ করেন। সে দেশের নিয়ম অনুসারে রাত্রি দুই প্রহরের পর হইতে দিবস গণনা হয়। যে গুণী ও গুণজ্ঞ স্ত্রী ও পুরুষগণ রাজার মৃত্যু শয্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজার রোগ লক্ষণ ও মৃত্যু লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের লিখন অনুসারে জানা যায় যে রাত্রি ২টা ২৫ মিনিটের সময় রাজার প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হয়। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে সূর্য্যোদয়ের কালের অন্তর ৬ ঘণ্টা। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে ভারতে যখন দিবা আট ঘটিকা, সেই সময়ে ব্রিষ্টলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণত্যাগ হইয়াছিল। উভয় দেশেই তাহা ইংরাজী সেপ্টেম্বর মাসের ২৭শে তারিখ। বাঙ্গালা মাসের গণনায় এই ২৭শে

সেপ্টেম্বর দিবসে, কখন ১০ই, কখন ১১ই, কখন বা ১২ই আশ্বিন হয়।

১৭৫০ শকে যে তিথিতে এবং যে বারে রামমোহন রায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়, অদ্য সেই শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথি, এবং সেই বার—শুক্রবার।* অনন্তচতুর্দ্দশী তিথিতে রাম-মোহন রায়ের পুত্র তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, এমন শুনা যায়। অতএব অদ্য দিব্যধামবাসী সেই মহাত্মার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দুই কার্য্যের প্রশস্ত অবসর।

চান্দ্রবর্ষ গণনানুসারে ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষে এ দেশে পিতৃ-পুরুষদিগের নামে তর্পণ করিবার সাধারণ বিধি আছে। প্রতি বৎসর এই সময়েই রামমোহন রায়ের বার্ষিক তর্পণের কাল উপস্থিত হয়।

নিত্যং স্নাতা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষি পিতৃতর্পণং।

এই বিধি অনুসারে প্রত্যহ দেব ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে চান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ঐ তর্পণীয় পুরুষগণের নামে জলাঞ্জলি দান করার নিয়ম এ দেশে প্রবর্ত্তিত

* এই প্রবন্ধে কোন সন তারিখ দেওয়া নাই। তিথি ও বারের হিসাবে ১৩১৪ সালের ৩রা আশ্বিন শুক্রবার অনন্তচতুর্দ্দশী হয়। সম্ভবতঃ ঐ তারিখে এই প্রবন্ধ কোথাও পঠিত হইয়াছিল। প্রঃ

হইয়াছে। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এ দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক উক্ত পিতৃপক্ষে সূর্য্যোদয় সময়ে পবিত্র জলাশয়ে অর্দ্ধমগ্ন হইয়া ব্রহ্ম, রুদ্র, মরীচি, অত্রি, সনক, সনাতনাদি দেব ঋষি মুনি ও সাধুগণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাদের সন্তৃপ্তিকামনায় উদক দান করিয়া থাকেন। এইদিন কেবল যে নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়জনের তর্পণ হয়, এমন নহে। যিনি বান্ধব, অবান্ধব বা যিনি জন্মান্তরে বান্ধব ছিলেন, তাঁহারও নামে তর্পণ করিবার বিধি আছে। কেবল যে বান্ধব সম্পর্কে তর্পণ করিতে হয়, তাহাও নহে। তর্পণের এমন নীতি যে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি কোন জীব তর্পণ কামনায় বহির্ভূত নহেন :—

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥

যাঁহারা এবম্প্রকারে "দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ" অর্থাৎ বিশ্বসংসারের তাবৎ প্রাণীকে তর্পণ করিতে বলিয়াছেন, সেই মনীষী ঋষিগণের আরো এক উদার ও মহান্ লক্ষ্য এই দেখা যায়, যে, যিনি জগতের হিতের নিমিত্ত আপনার হিত ত্যাগ করিয়াছেন,—যিনি কোন মহৎ ধর্ম্ম স্থাপন নিমিত্ত আপনার প্রাণ মন সর্ব্বস্ব

সমর্পণ করিয়াছেন,—তাঁহার উদ্দেশে বিশেষ রূপে তর্পণ জলাঞ্জলি প্রদান করা হয়। মহামতি ভীষ্ম পিতৃসন্তোষের নিমিত্ত আপনি রাজ্য, কলত্র, পুত্র ও তৎসহিত সংসারের সকল সুখ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতৃভক্তির এই অতুলনীয় উদাহরণের পূজার নিমিত্ত ঋষিগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, যেহেতু ভীষ্ম পিতৃ-তর্পণ উদ্দেশে আপনার তর্পণের উপায়ভূত সন্তানের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব সমস্ত পৃথিবীর লোক তাঁহার সন্তান স্থানীয় হইয়া স্ব স্ব পিতৃতর্পণের সহিত তাঁহারও তর্পণ করিবে। এই বিধি অনুসারে আমরা সাধারণ তর্পণের পরে—

> বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায়চ।
> অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিয়া থাকি। এই প্রকারে সকল শর্ম্মার সহিত ভীষ্মবর্ম্মার অর্চ্চনা হয়।

যে পরমোদারচিত্ত মহাপুরুষেরা এবম্প্রকারে আমাদিগকে পিতৃপুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং গুণী হিতৈষী ও ধর্ম্ম সংস্থাপকগণের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা দিয়াছেন—যাঁহাদের প্রণীত শাস্ত্র বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া আজি সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তবাসিগণ এককালে আব্রহ্ম স্তম্ব

পর্য্যন্ত জগতের আপ্যায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহা-দের মহীয়সী শিক্ষাপ্রণালীর কি সমুচিত স্তুতি করিতে পারি?

পরন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা যে এই ঋষিদিগের সন্তান বা শিষ্য, একথা কি বলিবার আমাদের মুখ আছে? আমরা কি ঋষিদিগের কোন সুনীতির অনুসরণ করিয়া থাকি? যদি সে প্রবৃত্তি আমাদের থাকিত, তবে আজি কি এত মহাজনগণ আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতেন? থাকিতেন না। যদি আমরা যথার্থ পিতৃপূজা করিতাম, তাহা হইলে কখনই আমাদের উত্তরোত্তর অধঃপতন হইত না।

পরন্তু এ সকল খেদ করিবার সময় আর নাই। অধঃপাতের সহস্র ক্লেশ আমাদিগকে নিষ্পেষিত করি-য়াছে। অতঃপর পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করি। তাহাদের বলে বলসঞ্চয় করি। পিতৃপুরুষগণের অমোঘ সাক্ষাৎ স্নেহ মমতার কথা মনে হইলে কি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয় না? ধর্ম্মোপ-দেশকগণ গুরুগণ আচার্য্যগণ আমাদিগকে সৎপথে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই উদার প্রেম স্মরণে কি চিত্তবৃত্তি বিস্ফারিত* হয় না? আমরা কি এমনই কুটিল,—এমনই স্বার্থপর,—এমনই

ক্ষুদ্রচেতা হইয়াছি যে পিতৃপুরুষগণকে, সাধুসজ্জনকে ধর্ম্মাত্মাগণকে স্মরণ করিব না! পূর্ব্বপুরুষগণ এই মর্ত্ত্য-ধাম ছাড়িয়া গিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্নেহময় মধুময় সেই পবিত্রাত্মগণ আমাদের প্রতি চিরদিন করুণা-পূর্ণ। আমরা কি এমনি দুর্ভাগ্য যে তেমন উদ্যত হস্ত হইতে মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে পারিব না?

পিতৃপুরুষদিগের স্মরণে আমরা অমৃতধামে উত্তীর্ণ হই। তখন বায়ু মধুময় হয়, জলধি সকল মধুময় হয়, সকলই মধু ক্ষরণ করে। হৃদয়ের গ্রন্থিসকল মুক্ত করিয়া দেও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে দৃষ্টি কর। সকলকে প্রেম কর। তোমার এই তর্পণে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হইবেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, আমাদের কি প্রকার কৃতজ্ঞতার ভাজন, কি প্রকার তর্পণযোগ্য তাহা কি আরো বলিতে হইবে? কেবল সাধারণভাবে নয়, বিশেষ-ভাবেও রামমোহন রায়কে আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্পণ অথবা তাঁহার নামে তর্পণ করিতে হয়।

এ দেশে সকলেই এক্ষণে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখুন, রামমোহন রায় তাঁহাদের এই অধিকার লাভের মূল। রামমোহন রায়ের উদয় না

হইলে বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুবাদ ও তাহার সর্ব্বত্র প্রচার আরও কত কালে হইত, অথবা হইত কি না তাহা বলা দুষ্কর।

যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার গুণে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহারা স্মরণ করিয়া দেখুন যে, সর্ব্বপ্রথমে রামমোহন রায় এদেশীয়দিগকে স্বকীয় ব্যয়ে স্বতন্ত্ররূপে ইংরাজী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্থাপিত ইংরাজী স্কুল, তাঁহার মৃত্যুর পর কিছুদিন অপর হস্তে পরিচালিত হইতেছিল। শুনিয়াছি সুপ্রসিদ্ধ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই স্কুলে প্রথমে অধ্যয়ন করিয়া যশঃপ্রাপ্ত হয়েন।

যাঁহারা ইংরাজী বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ঈশ্বরকৃপায় তাহার উন্নতি সাধনে সক্ষম ও তজ্জন্য মহতীপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা চিন্তা করুন যে কেবল এই মহৎ ফলের আশাতেই রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারই বাক্যে গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তনায় সাহসী হইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাবে ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুক থাকুন। তাঁহারা রামমোহন রায়ের জীবন আলোচনা করিলে বুঝিবেন, কি প্রকারে তাঁহারা অপঘাত

মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, এবং রামমোহন রায় কি উজ্জ্বলবাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধি, চরিত্র ও গুণ গরিমার কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

সভ্যতার বাহ্যচিহ্ন পরিচ্ছদ পারিপাট্যেও রামমোহন রায় এ দেশের আদর্শভূত। তাঁহার প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া সভ্যতাভিমানিগণ এখনো প্রকৃত সভ্যতার কিছু কিছু নূতন বিচার করিতে পারিয়াছেন।

যাঁহারা এ দেশের সীমান্তে বা দ্বীপদ্বীপান্তরে থাকিয়া স্নিগ্ধনেত্রে এই মাতৃভূমির প্রতি দৃষ্টি করেন, তাঁহারাও দেখিবেন, যে তির্ব্বতযাত্রী বা ইংলণ্ডবাসী রামমোহন তাঁহাদের অগ্রগামী নেতা স্বরূপ! বর্ত্তমানকালের সমুদ্র যাত্রা-কুশল সুপুরুষগণ চিন্তা করুন, কিঞ্চিদূন ষষ্ঠিবর্ষ দেশীয় রামমোহন কি সাহসে এবং কি অধ্যবসায়ে পাল-ভরের জাহাজে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া স্বজাতির মর্য্যাদার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিতেছেন!

যাঁহারা এক্ষণে রাজকীয় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহারা দেখুন, তাঁহাদের বিচারকের পদপ্রাপ্তি ও বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত ১৮৩২ অব্দে পার্লামেণ্ট মহাসভায় রামমোহন রায়কে কত কথা বলিতে হইয়াছিল।

যাঁহারা ইংলণ্ডে ভারতীয় প্রতিনিধি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা স্মরণ করুন, সপ্ততি বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়া চার্টর পরিবর্ত্তনের সময় রাজা রামমোহন রায়ের উষ্ণীশযুক্ত দীর্ঘকলেরর কতবার পার্লামেণ্টের মহাসভায় দৃশ্যমান হইয়াছিল।

রামমোহন রায় কলেজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী না হইয়া কি প্রকারে সংস্কৃত শিক্ষার আশা করিতেন, তাহাও একটী চিন্তনীয় বিষয়। তিনি ইহা বিলক্ষণ জানিতেন যে টোলের অধ্যাপকদিগের অর্থাভাবে বহু কষ্ট হইবে। অতএব রামমোহন রায় গভর্ণমেণ্টের নিকট এই অভিপ্রায় জানাইয়া ছিলেন যে, দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতিতে অধ্যাপকগণ সংস্কৃত শিক্ষা প্রদান করুন। গভর্ণমেণ্ট তদবস্থাতেই তাঁহাদের অর্থ সাহায্য করিবেন। বহুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

এতগুলি সম্প্রদায়ের লোক রামমোহন রায়কে আপনাপন সৌভাগ্যবৃদ্ধির মূলীভূতরূপে চিন্তা করিতে পারিবেন। এমন মহাজন আমাদের আর কয়টী আছেন?

এখনো যদি তোমারা রামমোহন রায়ের প্রতি সমুচিত কৃতজ্ঞ হইতে না শিখিলে, তবে কিছুদিন অপেক্ষা কর;

রামমোহন রায়ের মাহাত্ম্য আরো মহোজ্জ্বলরূপে দেখিবে। যখন সর্ব্বদেশের লোক রামমোহন রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তোমরা সর্ব্বদেশের লোকের অনুসরণ করিও। আর কি বলিব!

বস্তুতঃ রামমোহন রায় কেবল এদেশের লোকের পক্ষে মহাজন, এমন নহেন। তিনি সমস্ত পৃথিবীর লোকের পক্ষে মহাজন। রামমোহন রায়ের পরলোক গমনের পরে তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতার বশে ইংলণ্ডবাসিগণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা আছে :—

A stranger? No, thy caste was humankind
Thy home wherever freedom's beacon shined!

Pure generous mind all that was just and true
All that was lovely holiest brightest best
Kindled by soul of eloquence anew
And responsive chords in every breast.

এই অষ্টষষ্ঠি বৎসর পরে স্কটলাণ্ডে এক মহাসভায় এই মহতী গীতি বিশ্রুত হইয়াছিল :—

Sing, let's sing, and waft the blessing
Below around above
Every heart expressing
Peace unity and love

ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার মধ্যে লোকের শান্তি ব্যাহত হইয়াছে, অগ্নিকার্য্য ঘটিতেছে; তাহাতে প্রপীড়িত হইয়া তদ্দেশবাসিগণ International Law Association নামে এক সভা করিয়াছেন। উভয় দেশের সর্ব্বোচ্চপদাধিষ্ঠিত মহারথিগণ একত্র হইয়া এক্ষণে এই চিন্তা করিতেছেন যে সর্ব্বভূতহিতেরতঃ মহাজনগণের সাম্য-নীতি অবলম্বন না করিলে আর রক্ষা নাই। এই মহা-সভার উক্তিতে আমরা রামমোহন রায়েরই উক্তির প্রতি-ধ্বনি শ্রবণ করিতেছি।

কবিবর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা।*

কলিকাতায় এক মাস ধরিয়া এত কাণ্ড ঘটিল, তখন আমি মেদিনীপুরে। কংগ্রেসের ঘটা বা রাজদর্শনের উৎসাহ-তরঙ্গ, আমাকে মেদিনীপুর হইতে নাড়াইতে পারে নাই। এখন আমি এই অসময়ে কলিকাতায় কেন? ইহা বলিতেছি।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত বঙ্গবাসী সাহিত্য-সেবিগণ কবিত্বের সম্মাননায় অভিনন্দন করিবেন। আমি সেই শুভদর্শন দেখিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

টাউনহেলে প্রবেশ করিয়াই দেখি কবিবরের সকল বয়সের শত প্রকার ফটোগ্রাফ্ সজ্জিত। তাহার পরে বৃহৎ হল ভরিয়া বহুলোকের সমাগম। চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া সকলে কবিসম্বর্দ্ধন প্রকরণগুলি দর্শন ও শ্রবণ

---

* বিগত ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ (১৯১২ খৃষ্টাব্দ, ২৮ শে জানুয়ারি) রবিবার অপরাহ্ণ চারিটার সময় কলিকাতা টাউনহলে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কবিবরকে যে অভিনন্দন করেন, তদুপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত এবং ১৩১৮ সালের ২২ শে মাঘের মেদিনীবান্ধবে প্রকাশিত হয়। প্রঃ

করিতেছেন। এতগুলি বিদ্বান্ ও সম্ভ্রমশালী লোকের একবাক্যতায় রবীন্দ্রনাথের কবি-সম্মানের প্রতিষ্ঠা হইল। কবি বাগ্‌দেবীর প্রসাদকেই লক্ষ্য করিলেন। ভক্তেরাও, সরস্বতীর প্রকৃত ভাবে অর্চ্চনা হইল জ্ঞান করিয়া, কৃতার্থন্মন্য হইলেন।

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ (মধ্যম ভ্রাতা) স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এদেশীয় প্রথম সিভিলিয়ান। বাঙ্গালার নয়, বোম্বাইর,—এমন ভেদবিচারের তথন সময় ছিল না। প্রথম ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ান বলিয়াই তাঁহার সম্মান চূড়ান্ত হইয়াছিল। তাঁহার অভিনন্দনার্থ মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সপ্ত-সরোবরা উদ্যান বাটিকায় মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই প্রথম ঘটনার পর কত গুণী ও মানী ইণ্ডিয়ান সিভিলিয়ান ইংরাজ যুবকদিগকে বিদ্যা-বুদ্ধিতে পরাস্ত করিয়া বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন; কিন্তু আর কেহ তেমন মর্য্যাদা পান নাই। তদনুরূপ কবিত্ব-সম্মান সেই সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার ভাগ্যে ছিল। ইহা তাঁহার অল্প তপস্যার ফল নহে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাসায় ফিরিলাম। রাত্রিকালে :—

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী

তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন।"

এই গীতবাক্য স্মরণ হইল। তখনই রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া পত্র লিখিলাম :—

"আপনার পিতার এই আশীর্ব্বাদ ছিল, যে তপস্বী অপেক্ষা অধিক হইবে, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগী হইবে। সে মতে টাউন হলে এ কি সম্বর্দ্ধনা হইল!"

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনায় বলেন :—

"তোমার কথা হেথা কেহতো বলে না;
করে শুধু মিছে কোলাহল।"

ইহা সেইরূপ এক কোলাহল নয় কি?

ঈশ্বর-বিরহিত শিক্ষায় এদেশীয় লোকেরা সাধুতায় ও ভদ্রতায় উত্তম সাহিত্য-সেবী মাত্র হয়েন, ঈশ্বর-সেবী হয়েন না। সেই বিড়ম্বনায় এ দেশের নীতি-পদ্ধতি নিম্নস্তরে রহিয়া গেল, উপরে উঠিয়া সকল লোককে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় ভরপূর করিতে পারিল না; তাহাদিগকে কর্ম্মদক্ষতায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সুদৃঢ় করিতে পারিল না। তাহাদের আলস্য, স্বার্থপরতা ও বৃথা-অভি-

মান সর্ব্ববিধ উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া পড়িল। এই হেতু এ দেশের লোকেরা যাহা করেন, তাহাতে গভীরতা জন্মে না। ভাসা-ভাসা কার্য্য অধিককাল স্থিরপদে থাকে না; তাহা হইতে স্থায়ী ফলের প্রত্যাশা প্রথমাবধি সন্দেহ-দোলায়িত হইতে দেখা যায়। এইজন্য এদেশের সকল কার্য্যকেই এক একটী "হুজুগ" নাম লইয়া বিদায়গ্রহণ করিতে হয়।

আজি কালি সকল সংবাদ পত্রে সর্ব্বস্থান হইতে সরস্বতী পূজার বিবরণ শুনিতেছেন; কিন্তু তাহাতে নূতনত্ব কিছু পান কি? যখন বিদ্যা সজাগ ছিল, তখন সরস্বতী দেবীর কিরূপ আরাধনা হইত, তাহা

"যা কুন্দেন্দু তুষার হার-ধবলা।"

ইত্যাদি দু একটী স্তুতি বন্দনাতেই বিদিত হয়। এক্ষণে মৃতকল্পা বিদ্যা দ্বারা তেমন আর কি হইবে? কখনো কোন স্থানে পুরাতন সংস্কৃত ভাষার নাটকের নূতন নাট্যরঙ্গী তামাসা হয়, এইমাত্র। তদতিরিক্ত যে ভোজনামোদ, তাহার উল্লেখ না করাই ভাল।

আমি রবীন্দ্রনাথকে ঔপনিষদিক কবি বলিতেছি। "বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যঃ" হইতে জড়ীভূতা

বিদ্যার উন্মেষ প্রার্থনায়, তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত বা তাদৃশ কবিতা রচনা করেন। সাধারণ কবিতায় তাঁহার যে কৃতিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার প্রশংসাবাদে এই পঞ্চাশত্তমী পর্ব্ব হইল। তদতিরিক্ত তাঁহার যে মর্য্যাদা আমরা অনুভব করিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা কিসে হইবে ? ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁহার পবিত্র চরিত্রের প্রাণগত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। সেদিকে দৃষ্টি-পাত না হইলে এই ব্রহ্মচারী যুবা পুরুষের যথোচিত পরিচয় লওয়া হইল না।

রবীন্দ্রনাথ সাধারণ লোকের আভিমানিক আত্মবঞ্চনা দেখিয়া ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া সখেদে বলিয়াছেন,

"তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না ;
করে শুধু মিছে কোলাহল !
সুধা-সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল ॥"

ঈশ্বরানুরাগী না হইয়া বিষয়ী লোকেরা কেমন অধমতা প্রাপ্ত হয়, তাহা কালিদাস, শকুন্তলা-গ্রন্থে স্নাতাস্নাত এবং জাগ্রত ও নিদ্রাগত ব্যক্তির উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া-ছেন। রবীন্দ্রনাথ নানা সঙ্গীতে সেইরূপ সুখসঙ্গী ভোগ-

বিলাসী লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনাদের ভ্রান্তি ও শোচনীয় দশা বর্ণন করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম-সমাজের স্থাপন সময়ে রামমোহন রায়ের সঙ্গিগণ গীতোক্ত আস্থরী প্রবৃত্তির প্রশমন উদ্দেশে গাহিতেন,—

"এই হলো" "এই হবে" এই বাসনায়।
দিবানিশি অন্ধ হয়ে দেখিতে না পায়॥"

একশত বৎসর পরে সেই কঠোর তত্ত্ববিদের গীত রবি ঠাকুরের ভাষায় কেমন মধুর হইয়াছে, তাহা, যিনি এই গীত শুদ্ধস্বরে শুনিয়াছেন, তিনি প্রণিধান করিবেন,—অন্যে নয় ;—

"পিপাসা হায়! নাহি মিটিল।
গরল রস-পানে,
জর জর পরাণে ;" ইত্যাদি

এইরূপ বিস্তর গীত আছে। কবিতাও আছে। উপনিষদের কঠিন তত্ত্বগুলি রবীন্দ্রনাথের লেখনী প্রভাবে অথবা সরস চিত্তের গুণে কেমন মনোহর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি দেখাইতে হয়, উপনিষদের মন্ত্রের আলোচনাও আবশ্যক হইবে।

এই ক্ষেত্র হইতে যদি সে আলোচনার ফোয়ারা ছুটে,

এই ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের নূতন শ্রী উঠিবে। তখন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পবিত্র বেদিকায় বসিয়া তিনি নূতনতর অভিনন্দন পাইতে থাকিবেন।*

---

* এই প্রবন্ধ প্রকাশের দেড় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে তাঁহার ভগবদ্বিষয়ক কবিতাপুস্তক গীতাঞ্জলী ইংরাজীতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। ইংরাজী গীতাঞ্জলী ঐ বৎসরে সুইডেনের নোবেল পুরস্কার সমিতি কর্ত্তৃক মানবজীবনের উচ্চ আদর্শের পরিপোষক পৃথিবীর সাহিত্য পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায় কবিবরকে উক্ত সমিতি নোবেল-পুরস্কার নগদ একলক্ষ বিশহাজার টাকা প্রদান করেন। পাশ্চাত্য জগতের মনীষি-গণ তাঁহার প্রশংসা-গীতি নানা সংবাদ পত্রে প্রচার করেন। সহকারী ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু এক সভায় তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ কবিবরের ভগবদ্বিষয়ক কবিতার মর্ম্ম গ্রহণে আগ্রহান্বিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ভক্ত দিল্লীর সেণ্টষ্টিফেন্-কলেজের অধ্যাপক মিঃ সি এফ এণ্ড্রুজকে শিমলা শৈলে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়া এক সভা করেন। মিঃ এণ্ড্রুজের বক্তৃতায় লর্ড হার্ডিঞ্জ কবিবরের ভগবদ্বিষয়ক কবিতার মর্ম্ম গ্রহণে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে *Poet laureate of Asia* অর্থাৎ এসিয়ার রাজ-কবি বলিয়া স্তুতিবাদ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবিবরকে ডি এল উপাধি প্রদান এবং কলিকাতার খ্যাতনামা স্বদেশবাসিগণ স্পেশেল ট্রেণে বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে গিয়া তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবের ভবিষ্যদ্বাণী এতদ্বারা কতক সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রঃ

ব্রাহ্মধর্ম্মের নৌকা।

আয় আয়রে ভাই কে দেশে যাবি

আয়রে এই নায়ে।

যদি বিদেশে মন পড়ল না তবে

আর কেন ভাই দাঁড়ায়ে॥

ও ভাই, এমন নৌকা পাবিনারে আর,

এ দেখ, সকল তুফান সামলে তরে * ভব পারাবার;

আবার ঝড়েতে আনন্দ বাড়ে,

ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটায়ে॥

এতে পরিপাটী আছে ঘর দ্বার,

তাতে ধর্ম্ম বলে সকল চলে পুত্র পরিবার।

এতে বিষয় ভোগেও পুণ্য বাড়ে।

ঠিক পথে হাল্ চালায়ে॥

এতে কাকেও কিছু দিতে নাই মাশুল,

এতে চাপ্‌লে পরে দেখতে পাবি

স্বদেশের কূল (পর পারের কূল)

আবার মাতা পিতায় দেখ্‌তে পাবি

মনের দিকে তাকায়ে॥

---

* কাটয়ে তরে বা চলে।

পরিশিষ্ট।

স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু

(১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণের "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

বিগত ২৮শে আশ্বিন সোমবার রাত্রি ১২টার সময় শ্রদ্ধেয় ঈশানচন্দ্র বসুর উনসত্তর বৎসর বয়সে দেহান্ত হইয়াছে। বিগত দুই বৎসর ধরিয়া তিনি নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। সংসারের নির্য্যাতন, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তিনি স্বীয় আবাসস্থান মেদিনীপুরের অন্তর্গত পিজলা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া একাকী আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতলের গৃহে আশ্রয় লইতেন। মস্তকের উপর কত ঝড় বহিয়া গিয়াছে—তাঁহাকে একদিনের জন্যও অবসন্ন করিতে পারে নাই। যখনই যাইতাম দেখিতাম তিনি পুরাতন পুস্তকের ব্যূহ রচনা করিয়া লেখনী চালাইতেছেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই ভাব ছিল। যৌবনে পঠদশায় মহাত্মা রাজনারায়ণ বসুর নিকট মেদিনীপুরের ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে ব্রহ্মমন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমস্ত জীবনকে সরস রাখিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কটকের জমিদারীতে যাইবার সময় যখন মেদিনীপুরে অবস্থান করিয়া রাজনারায়ণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার সম্বন্ধে গূঢ়-মন্ত্রণা করিতেন, তখন ঈশানচন্দ্র মহর্ষির সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা পাইলেন। যুবক ঈশানচন্দ্রের হৃদয়ে অগ্নি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে,

অনুকূল বাবুর প্রতীক্ষা করিতেছে ইহা দেখিয়া মহর্ষি ঈশানবাবুকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন ভার অর্পণ করিলেন। প্রচার উদ্দেশে ঈশানবাবুকে দেশ-বিদেশে যাইতে হইত। তিনি প্রচার ব্যপদেশে ঢাকায় ও এলাহাবাদে গমন করিয়াছিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষির উপর তাঁহার অপরিমেয় শ্রদ্ধা ছিল। রামমোহন রায়ের প্রকাশিত পুস্তকাবলী লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল। ঈশানবাবু ঠিক এই সময়ে সেই গ্রন্থরাজি বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে রামমোহন রায়ের রচনাবলী কোথায় লুপ্ত হইয়া যাইত। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কত ঋণী, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাকে উৎসাহদান করিতে লাগিলেন—মহর্ষিদেবেরও অর্থসাহায্যের বিরাম ছিল না। এই সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থাবলী ও পরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে রামমোহন রায়ের ইংরাজী গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে ঈশানচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ কাল চলিয়া যায়। এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে ঈশানচন্দ্রের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ ত্যাগস্বীকার ভিন্ন উত্তরকালে রামমোহন রায়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ আকারে বাহির হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

ঈশানচন্দ্র আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন ভাবের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ছবি দর্শাইবার জন্য

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতাগুলি প্রকাশ করেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, রামমোহন রায়কে বুঝিতে এখনও কালবিলম্ব ঘটিবে। ঈশানবাবু রামমোহন রায়কে বুঝিবার যে অমূল্য উপকরণগুলি রাখিয়া গেলেন, তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গসমাজ তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য ঋণী।

এতদ্দেশে নীতিশিক্ষাপ্রচারের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত হিন্দুধর্ম্মনীতি, নীতিকবিতাবলী প্রভৃতি কয়েকখানি নীতি-গ্রন্থ আছে। তাহারও দুই তিন সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি নীতি-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত "নারীনীতি" ও "স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ" সর্ব্বজনপ্রশংসিত। ভবানীপুর কাঁসারিপাড়াতে তাঁহার উদ্যোগে হিন্দুবালিকাবিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি মহর্ষিদেবের একখানি ক্ষুদ্র জীবনী প্রণয়ন করেন। নব্যভারত নবজীবন, জন্মভূমি, ভারতী, মেদিনীবান্ধবে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছিল। তিনি কিছুদিনের জন্য কায়স্থপত্রিকার সম্পাদকতা ও ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত দৈনিক প্রভাতী পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে "বঙ্গবাসীর" সাহায্যে শিবায়ণ, গীতগোবিন্দ, গোবিন্দমঙ্গল এবং নিজ ব্যয়ে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থ প্রকৃত পাঠনির্ব্বাচনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রথম সহকারী সম্পাদক ছিলেন।*

হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের তিনি চিরপক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। নিন্দা প্রশংসা একদিনের জন্যও তাঁহাকে বিচলিত করে নাই। তাঁহার মত স্বাধীনচেতা, অক্লান্ত পরিশ্রমী অতি অল্প লোকই দেখিয়াছি। এমন নীরব কর্ম্মযোগী আর কখন দেখিব কি না সন্দেহ। এত কষ্ট, এত ক্লেশ, এত দৈন্য তিনি নীরবে সহ্য করিয়া গেলেন; একদিনের জন্যও দীনভাবে কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা করেন নাই। শেষদশায় মনু-সংহিতা, ভাগবৎ, বৈষ্ণবগ্রন্থাবলী, উপনিষদ, বাইবেল তাঁহাকে সঞ্জীবিত রাখিত। তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য অমূল্য সম্পদ রাখিয়া গেলেন—আমরা তাঁহার সমুচিত সংকার করিতে পারিলাম না। সেই পরমমাতা তাঁহাকে তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া চরমপুরস্কার পরমশান্তি দান করুন, ইহাই এখন আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

---

* বিগত ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে তিনি মেদিনীপুর হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া মান্দ্রাজ গমন করেন। ফিরিবার সময় সেতারা পুণা, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি পৃথিবীর ইতিহাস সমুদ্র মন্থন করিয়া *The Mirror of Progress in History* নামক একখানি চার্ট প্রকাশ করেন। প্রকাশক।